নতুন দাওয়াত নতুন পয়গাম

নতুন দাওয়াত নতুনপয়গাম

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র.



সূচিপত্র

নতুন দাওয়াত নতুন পয়গাম

মুসলিম বিশ্বের সামনে আজও দুনিয়ার জন্য নতুন পয়গাম এবং জীবনের জন্য নতুন দাওয়াত অক্ষুন্ন রয়েছে। এটি ওই পয়গাম যা মুহাম্মদ সা. সাড়ে তেরশ বছর পূর্বে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। এটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও স্পষ্ট পয়গাম। এর চেয়ে জোরালো, উন্নত ও বরকতময় পয়গাম আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো ভাষায় কেউ উপস্থাপন করতে পারেনি।

শাশ্বত পয়গাম

এটি বস্তুত ওই পয়গাম যা শুনে মুসলমানগণ মদীনার গণ্ডি পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন বিশ্বময়। মন্তর করেছেন পৃথিবীর আনাচে-কানাচে। 'তোমরা এ পর্যন্ত কিভাবে এসেছ'–ইরানে বাদশাহর এ প্রশ্নের জবাবে মুসলিম সেনাপতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় তাপর্যপূর্ণ যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন সেই কর্মসূচিতে আজও কোনো পরিবর্তন আসেনি। সেই পয়গাম আজও বহাল রয়েছে। সেনাপতি উত্তরে বলেছিলেন–আল্লাহ আমাদেরকে এজন্য পাঠিয়েছেন যেন আমরা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী লোকদেরকে সৃষ্টজীবের পূজা থেকে ফিরিয়ে এক স্রষ্টার ইবাদতে নিমগ্ন করিয়ে দেই, দুনিয়ার সংকীর্ণতা কাটিয়ে প্রশস্ততায় এবং ধর্মীয় অনাচার ও অবিচার মূলোৎপাটন করে ইসলামের ন্যায়, সাম্য ও সততার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেই। সহস্রাধিক বছর পূর্বের সেই শাশ্বত পয়গামে আজও এক অক্ষর কম-বেশির প্রয়োজন নেই।

সভ্যতার উৎকর্ষেও যে পয়গামের জন্য উন্মুখ সবাই

একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান বিশ্বেও এমনি তরতাজা প্রেক্ষিত বিরাজ করছে, যা খৃষ্টাব্দ ৬ষ্ট শতকের তৎকালীন বিশ্বে বহমান ছিল। আজও লোকেরা হাতে তৈরি নিথর পাথরের মূর্তিকে সেজদা করছে, আজও এক স্রষ্টার ইবাদত অপ্রচলিত ও অপরিচিত। এখনও গায়রুল্লাহর ইবাদতের বাজার সরগরম, প্রকৃতি পূজার

ব্যাপ্তি সর্বত্র। দুনিয়ার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব শক্তিশালী ও সম্পদশালীদের হাতে করায়ত্ব, সামাজিক-রাজনৈতিক ও জাতীয় নেতৃত্ব তাগুতের হাতে ন্যস্ত। তাদের সামনে সবাই করজোড়ে। তাদেরকে সমীহ করা হচ্ছে, তাদের সামনে মাথা ঝুঁকানো হচ্ছে, যেভাবে বাতিল মাবুদের সামনে সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে মাথা ঝুঁকানো হতো।

বর্তমান মানবসভ্যতা নিজেদের প্রশস্তি, উপকরণের পরিব্যাপ্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উৎকর্ষ এবং পারস্পরিক সম্পর্কের অভাবনীয় উন্নতি সত্বেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে যুগের চেয়েও অধিক সংকীর্ণতার ভুরে আবদ্ধ। বর্তমান প্রকৃতিপূজারী মানুষেরা দুনিয়াতে অন্য কিছুর অস্থিত্ব মেনে নিতে পারে না। নিজের ফায়দা, প্রবৃত্তির তাড়না ও আত্মপূজা ছাড়া তাদের কোনো জিনিস মনঃপূত নয়। আত্মম্ভরিতার বিশাল সাম্রাজ্যে অন্য কারো অস্থিত্বকে মেনে নিতে নারাজ। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও সীমাতিরিক্ত জাতিপ্রীতি অন্য দেশ বা জাতির প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণাকে উস্কে দিচ্ছে। অন্যের পূর্ণতায় অস্বীকৃতি ও অন্যের অধিকার দলিত করা সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখ ধাঁধানো উৎকর্ষের যুগের নেতৃত্ব ও শাসননীতি সংকীর্ণতার আবরণে ধূসর। যারা স্বাচ্ছন্দময় জীবনযাপন করছে কিংবা অঢেল সম্পদের মালিকানায় অধিষ্ঠিত তারা যাদের প্রতি রুষ্ট তাদের জীবনকে করে দিচ্ছে সংকীর্ণ আর যাদের প্রতি তুষ্ট তাদের জীবনে এনে দিচ্ছে প্রশস্তি। বিশাল জগৎ, সবুজ শ্যামল ভূখন্ড লোকদের জন্য অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। জাতীয়তা ও সভ্যতা অনাথ ও অবুঝ শিশুর মতো অন্যের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে।

বর্তমানে মানুষ মানুষের ওপর ভরসা রাখতে পারছে না। প্রত্যেকে অপরকে মন্দ ধারণা ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে। তারা পরস্পরে শত্রু ভাবাপন্ন। কুরআন মাজীদের স্পষ্ট ও অলংকারপূর্ণ শব্দাবলী অনুযায়ী পৃথিবী প্রশস্ততা সত্ত্বেও যেন দিন দিন সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। অন্তরের সজীবতা অন্তরেই বিরান হয়ে যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক ও শাসনতান্ত্রিক নতুন নতুন শৃঙ্খল ও গোলামীর বেড়ি লোকদের গলায় ঝুলছে। প্রতি মুহূর্তে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জুয়াদের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা হয়। যুদ্ধের ডংকা বাজছে সর্বত্র। হাঙ্গামা, বিশৃঙ্খলা জীবনের নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আধুনিক যুগেও ধর্মীয় জাহেলিয়াত

নিঃসন্দেহে আজও ধর্মের আবরণে কৃত অনাচার ও অবিচার থেকে রক্ষা করে লোকদেরকে ইসলামের ন্যায় ও সমতার গণ্ডিতে আশ্রয় দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বহাল রয়েছে। উদার চিন্তা ও চরম উৎকর্ষের এ যুগেও এমন ধর্মের অস্থিত্ব পাওয়া যায় যাদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ রীতিমত হাস্যকর। তাদের ধর্মগুরুদেরকে তারা নির্বোধ প্রাণীর মতো নিজেদের কাবুতে রাখে। তাদের বুদ্ধি ও বিবেকের স্বকীয়তা নষ্ট করে দেয়। এমন কিছু ধর্মও রয়েছে যাকে ধর্ম হিসেবে আখ্যা দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। ক্ষমতার আধিপত্য এবং অন্ধ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পুরনো দিনের ভ্রান্ত ধর্মসমূহ থেকে কোনো দিকে পিছিয়ে নেই তথাকথিত এসব আধুনিক ধর্ম। এগুলো মূলত রাজনৈতিক দর্শন ও অর্থনৈতিক মতবাদ–যার প্রতি লোকদের বিশ্বাস ধর্মের মতো অবিচল ও অনড়। এগুলো প্রাচীন যুগের অন্ধ জাতিপ্রীতি, বংশীয় কৌলিন্য, গণতন্ত্র এবং বহুত্ববাদের নতুন সংস্করণ। হাতেগড়া এসব নতুন ধর্ম অবিবেচনা, অনাচার ও সংকীর্ণ ধ্যান-ধারণায় জাহেলী যুগের বাতিল ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ থেকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগিয়ে। কোনো রাজনৈতিক মতবাদ ও সামাজিক দর্শনের প্রতি ভিন্নমত পোষণের সাজা বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন যুগের ধর্ম ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণের চেয়েও অধিক। আজকে যদি কোনো দল বা মতাদর্শের ভিত সবল হয়ে যায় তবে বিরোধীদের জীবন ধারণের অধিকার হরণ করে নেয়। ভিন্ন মতাদর্শীদের পড়তে হয় কঠিন দুর্ভোগে। বিগত শতাব্দীর দু'টি বিশ্বযুদ্ধ কোনো ধর্মীয় বিরোধের জের ধরে কিংবা কোনো ধর্মাবলম্বীদের আন্দোলনের কারণে সংঘটিত হয়নি। বরং নিছক রাজনৈতিক সংঘাত ও জাতিগত বিদ্বেষের কারণেই হয়েছে। স্পেনের গৃহযুদ্ধ (civil wars) কোনো ধর্মীয় সংঘাতের ফসল ছিল না। বরং রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতা এবং নেতৃত্বের প্রতি প্রচণ্ড মোহের কারণেই ছিল।

অভিন্ন পয়গাম

আজও মুসলিম বিশ্বের পয়গাম এক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য, নবীদের রিসালাত, বিশেষত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সা. এর নবুওয়াত এবং আখেরাতের ওপর ঈমান আনার দাওয়াত। এ দাওয়াত গ্রহণ করার প্রতিদান ও ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, অন্ধকারের অতলে হারিয়ে যাওয়া বিশ্বে আলোর সন্ধান মিলবে। মানবসভ্যতা তাগুতের আবদ্ধ জেলখানা থেকে মুক্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে। মানব জাতি অগণিত বাতিল মাবুদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর গোলামীতে নিবিষ্ট হতে পারবে। মানুষেরা জীবনের বিস্তৃত ভুবনে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারবে। আকীদাগত রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত হাতেগড়া ধর্মের শিকল থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতির ধর্মও মহান স্রষ্টার ন্যায় ও সমতার শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারবে।

আজকের পয়গাম আজকের বাস্তবতা

এই পয়গামের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও মহাত্ম এ যুগে যত স্পষ্ট এবং বোধগম্য হয়েছে এমন আর কখনও হয়নি। আজ অজ্ঞতার বাজারের মন্দাভাব,

জাহিলিয়াতের অন্তঃসারশূন্যতা লোকদের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট। লোকেরা জীবনের কাছে অসহায়, এ যুগের বাতিল মাবুদদের প্রতি নিরাশ। দুনিয়ার নেতৃত্বের আমূল পরিবর্তনের এটাই উপযুক্ত সময়। এ পর্যন্ত দুনিয়াতে নেতৃত্বের যত পরিবর্তন ঘটেছে তার উপযুক্ত সময় বর্তমান সময় থেকে বেশি ছিল না। যখন নৌকার মাঝি নৌকা বাইতে বাইতে দুর্বল হয়ে যায় তখন সে তার বৈঠা অন্য হাতে নেয়, সে হাতও যখন দুর্বল হয়ে যায় তখন পার্শ্ব পরিবর্তন করে। ব্রিটেন থেকে আমেরিকা, আমেরিকা থেকে রাশিয়ার মধ্যে বিশ্বনেতৃত্বের পরিবর্তনও নৌকার মাঝির হাত বদলের চেয়ে বেশি কিছু নয়। এটি আদর্শিক ও গুণগত কোনো পরিবর্তন নয়, নিছক ডান-বামের পার্শ্ব পরিবর্তন।

উদাত্ত আহবান

মানবতার সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ দুনিয়ার কর্তৃত্ব মানবতার খুনে রঞ্জিত অশুভ তাগুতি শক্তির হাত থেকে ছিনিয়ে ন্যায়, সমতা ও সাম্যের পতাকাবাহী মানবতার কাণ্ডারীদের কাছে ন্যস্ত করা। দুনিয়ার নেতৃত্বের গুণগত ও আদর্শিক পরিবর্তন ছাড়া মানবতার অবক্ষয় রোধ করা কখনও সম্ভব হবে না। এর জন্য প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্ব, যে নেতৃত্বের রূপরেখা তৈরি করে দেখিয়েছেন মানবতার মহান কাণ্ডারী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সেই নেতৃত্বই পারবে সমস্যার ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত মানব সভ্যতাকে মুক্তির শুভ পয়গাম শুনাতে।

দাওয়াতে দীনের স্বীকৃত পদ্ধতি ও কর্মকৌশল

আমি সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রশংসাস্তুতি গাইছি এবং শোকরিয়া আদায় করছি ওই সমস্ত লোকদের, যারা আমাকে ইসলামী দাওয়াতের এই বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমার জন্য এটি সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমি এমন লোকদেরকে সম্বোধন করছি যারা উম্মতের বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং সবাই ইসলামের খেদমতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমার মনোযোগ বৃদ্ধির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে, এই আলোচনা করছি এমন স্থানে (মক্কা মুকাররমা) যা ইসলামের প্রথম মারকায, রাসূল সা. প্রেরিত হওয়ার স্থান এবং দুনিয়ার সবচেয়ে পবিত্র ভূমি। আমি যদি নিজেকে সম্বোধন করে আরবের এক কবির কবিতা আবৃত্তি করি তবে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কবি বলেন 'হে হাওমাতুল জান্দালের বুলবুলি! তোমার জন্য গান গাওয়ার উপযুক্ত সময় এখনই। তুমি গান গাইতে থাক, কারণ তুমি এমন এক স্থানে অবস্থান করছ, যেখানে আমার প্রেয়সী তোমাকে দেখছে।'

প্রিয় সুধী! দাওয়াতে ইসলামের বিষয়বস্তু নতুন কিছু নয়। এ বিষয়ে অনেক কিছু লেখা ও বলা হয়েছে। বর্তমান সময়ে এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও বই-পুস্তক লেখা হচ্ছে। বরং এভাবে বলা উচিত যে, এ বিষয়ে স্বতন্ত্র লাইব্রেরী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এজন্য আমি চাই, আমার কথা-বার্তা শুধু দাওয়াতে দীনের পদ্ধতি ও কর্মকৌশল বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখব। তবে এর দ্বারা শুধু দাওয়াতের কর্মসূচীই নির্দেশ করবে না বরং মুসলিম বিশ্বের কর্মক্ষেত্র ও মুসলিম উম্মাহর করণীয় বিষয়েও আলোকপাত করবে। আমি আমার সীমাবদ্ধ পড়াশুনা, অতীত অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবতার আলোকে শুধু এর কর্মপরিধির ওপরই কিঞ্চিৎ নজর দেয়ার প্রয়াস পাব। সামর্থ্যের জন্য আল্লাহর তাওফীক কামনা করছি।

এক.
মুসলিম জনসাধারণের সকল শ্রেণীর মধ্যে ঈমানের সজীবতা বৃদ্ধি ও এর প্রোজ্জ্বল জ্যোতির বিচ্ছুরণ ঘটাতে হবে। কেননা বৃহৎ এই জনগোষ্ঠীকে ইসলামের সঙ্গে জুড়ে রাখা এবং এর জন্য তাদের অন্তরে জোশ তোলা মজবুত দুর্গ সদৃশ। এর ওপরই ইসলামের ভিত্তি। ইসলামের অস্তিত্ব ও বিকাশের মূলধন এটিই। প্রত্যেক মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য তা ব্যবহৃত হয়। আত্মসচেতন ও জাগ্রত কিছু লোকের কর্মোদ্যমতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্তরের প্রশস্তি, সর্বোপরি ইখলাসের পরাকাষ্ঠা দ্বারা সমগ্র জাতি ঝলসে ওঠে। সাফল্য ও সমৃদ্ধির বিস্তৃত ভুবন খুলে যায় তাদের সামনে। ঈমানী শক্তির প্রাবল্য, দীনের প্রতি উজ্জীবন এবং কাজের উদ্দীপনার জন্য এর শর্তাবলী পূরণ করা অপরিহার্য। মৌল কর্মপ্রণালীতে এমন গুণ থাকতে হবে যা আল্লাহর সাহায্যকে অনিবার্য করবে। সমস্যা থেকে উত্তরণ এবং শত্রুদের ওপর বিজয়ী হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। তবে এর পূর্বশর্ত হচ্ছে আকীদার পরিশুদ্ধি, এক আল্লাহর প্রতি নিটোল বিশ্বাস, যাবতীয় শিরক ও ভ্রান্ত ধারণামুক্ত হওয়া। জাহেলী রসম, অনৈসলামিক রীতিনীতি, দ্বিমুখী আচরণ, কাজে ও কর্মে সমন্বয়হীনতা এবং অতীত জাতির বিচ্যুত আচরণ থেকে বেঁচে থাকা, যা আল্লাহর শাস্তি ও রুষ্টতাকে অবশ্যম্ভাবী করে। তাছাড়া বর্তমান যুগের বস্তুবাদী সভ্যতার অসংলগ্ন আচরণ থেকেও দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। কারণ, প্রকৃতি পূজা মানুষকে শুধু স্রষ্টাবিস্মৃতই করে না বরং আত্মবিস্তৃতও করে ফেলে। যা দুনিয়াকে পতনের বেলাভূমিতে দাঁড় করিয়ে দেয়।
প্রত্যেকের দীনী অনুভূতিকে সঠিক পথে ব্যবহার করতে হবে। সুপ্ত অনুভূতিকে সর্বদা সতেজ রাখতে হবে, যাতে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও সৃষ্ট সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা যায়। শত্রু-মিত্রের পার্থক্য সহজেই নিরূপণ করতে পারে। চোখ ধাঁধানো উদ্ভাবন দেখে যেন ধোঁকায় না পড়ে যায়। ভবিষ্যতে যেন এমন কোনো বিপর্যয় নেমে না আসে যা অনৈতিক জাতিপ্রীতি এবং জাহেলী বর্বরতার কারণে সংঘটিত হয়। ভাষাগত বাড়াবাড়ি, প্রাচীন রেওয়াজ-রসমের কঠোর অনুসরণ, সর্বোপরি অবৈধ নেতৃত্ব ও ওপনিবেশিক চক্রান্ত মুসলিম জনসাধারণের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করে। দীনী অনুভূতির অনুপস্থিতি এবং ঈমানী দুর্বলতাই মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়ের প্রধান কারণ।

দুই.
ধর্মীয় ভাবধারা ও দীনী অনুভূতিকে বিকৃতি এবং বর্তমান যুগের পশ্চিমা দর্শনের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিভাষাসমূহকে দীনী উদ্দেশ্যে বর্ণনা থেকে বিরত থাকতে হবে। দীনকে নিছক রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ এবং বর্তমান যুগের বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে ইসলামী ভাবাদর্শের সমন্বয় সাধনের মত অতিমাত্রায় উদারতা প্রদর্শন থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। কেননা দীন ইসলাম চিরন্তন ও শাশ্বত, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও কালোত্তীর্ণ। ইসলাম যেকোনো ধরনের ব্যাখ্যা বিশেষণের উর্ধ্বে। মানবমস্তিস্কপ্রসূত কোন মতাদর্শের মানদণ্ডে এই আসমানী জীবনব্যবস্থাকে তুলনা করা চলবে না। ইসলামকে বিশেষণ করতে হলে ইসলামেরই দ্বারস্থ হতে হবে। আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতের মূলনীতি এটাই ছিল। এর জন্যই তারা জিহাদ করেছেন। নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়েছেন। এই মানদণ্ডেই আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।
মুসলিম উম্মাহকে এমন কাজ ও কথা থেকেও বিরত থাকতে হবে যা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার সম্পর্ককে শিথিল করে দেয়, পরকালের বিশ্বাসের স্তম্ভকে দুর্বল করে ফেলে এবং মুমিনের অন্তর থেকে আল্লাহর নির্দেশ পালনের জযবা, তাঁকে সন্তুষ্ট করার বাসনা ও তাঁর নৈকট্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্বহীন করে ফেলে। এর দ্বারা উম্মাহর বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহর কাছে এমন লোকের কোন মূল্যায়ন ও গুরুত্ব থাকে না। এমনিভাবে পৌত্তলিকতার বিশ্বাস, নিরেট শিরক এবং জাহেলী ধ্যান-ধারণা থেকেও মস্তিষ্ককে নিষ্কলুষ রাখতে হবে। বস্তুবাদী মতাদর্শের গতানুগতিক বিরুদ্ধাচরণ এবং ইসলামবিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদের মৌখিক বিরোধিতাকে যথেষ্ট মনে করা, দীনের শাশ্বত বিধানকে উপেক্ষা করে আধুনিক বস্তুবাদী মতাদর্শকে গ্রহণ করার নামান্তর।

তিন.
নবী করীম সা. এর প্রতি আত্মা ও অন্তরের এরূপ গভীর সম্পর্ক রাখতে হবে, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী যা নিজ সত্তা, পরিবার-পরিজন ও সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে। আখেরী রাসূল, শ্রেষ্ঠ মানব এবং হিদায়াতের আলোকবর্তিকা হিসেবে মুহাম্মদ সা. এর ওপর ঈমান আনতে হবে। নবীর সঙ্গে সম্পর্কই দীনী সফলতার চাবিকাঠি–এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করতে হবে। সুতরাং এমন কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকতে হবে যা তাঁর সঙ্গে স্থাপিত মহব্বতের ঝর্ণাধারাকে শুকিয়ে দেয় অথবা মহব্বতের সুদৃঢ় বন্ধনকে শিথিল করে ফেলে। এর দ্বারা দীনের স্পৃহা ও উজ্জীবন নির্জীব হয়ে যায়। ফলে সুন্নতের ওপর আমলে ত্রুটি আসে, মনের মাঝে হতাশার সৃষ্টি হয়, মেজাজ বিকৃত হয়ে যাওয়ার কারণে রাসূল সা. এর সীরত ও সূরতের প্রতি অনাসক্তি এসে যায়। নবীপ্রেমের নূরানী বাতি প্রজ্জ্বলিত করার পরিবর্তে নির্বাপিত করার কারণ হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের এ দিকটির প্রতি প্রত্যেককে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। বিশেষত আরব ভাইদেরকে এ ব্যাপারে গভীরভাবে ভাবতে হবে। কেননা আরবের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং নিকট অতীতের ঘটনাবলী তাদেরকে নববী আদর্শের এই ঝর্ণাধারা থেকে ছিটকে ফেলানোর চেষ্টা করেছে। যা তাদের জীবনের অনন্য পাথেয়, যার সবচেয়ে বড়

দাবীদার তারা, যা তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। কেননা নবী করীম সা. প্রেরিত হয়েছেন তাদের পূণ্যভূমিতে, কুরআনে কারীম অবতীর্ণ হয়েছে তাদের জবানে, রাসূল সা. কথা-বার্তা বলেছেন তাদের মাতৃভাষায়।

চার.

শিক্ষিত শ্রেণী যাদের হাতে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মিডিয়ার কর্তৃত্ব, তাদের অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। ইসলামের ওপর স্থিতিশীলতার দ্বারা উদ্দেশ্য তাদের মধ্যে এ কথার বিশ্বাস স্থাপন করা যে ইসলামের মধ্যে শুধু কালকে সঙ্গে নিয়ে চলা এবং উন্নতি-অগ্রগতির ময়দানে উৎকর্ষের যোগ্যতাই নয় বরং গোটা মানবসভ্যতার নেতৃত্বদানেরও যোগ্যতা রয়েছে। জীবনতরীকে দক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার সামর্থ্যও রয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতার কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের অনিবার্য পরিণতি থেকে রক্ষা করে সঞ্জীবনী সুধা পান করানোর ক্ষমতা একমাত্র ইসলামেই বিদ্যমান। শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এ কথার প্রমাণ পেশ করতে হবে যে, ইসলাম এমন কোনো প্রেরণা শক্তি নয় যা কখনও নির্জীব হয়ে পড়বে অথবা এমন কোনো মশাল নয় যা কখনও নিভে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। দীন ইসলাম একটি চিরন্তন, কালোত্তীর্ণ ও সার্বজনীন মুক্তির পয়গাম। এটি নূহ আ. এর কিশতির মতো একমাত্র আশ্রয়স্থল যেখানে আরোহন করার দ্বারা সলিল সমাধি থেকে বেঁচে যেতে পারবে।

দীনী যোগ্যতার ব্যাপারে আস্থার সংকট অথবা তা একদম না থাকা মূলত আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর একটি ব্যাধি। কারণ, পশ্চিমা সংস্কৃতির ধাঁধায় পড়ে তাদের অনুভব-অনুভূতি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। পশ্চিমাদের দেয়া টোপ গিলে তারা আজ বুঁদ হয়ে আছে। তাদের শেখানো বুলিই তারা আওড়িয়ে যাচ্ছে। এ শ্রেণীটিই সমস্ত উম্মাহর ধ্বংসের কারিগর এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যতার জন্য দায়ী। দর্শন ও সাংস্কৃতিক যে সব অস্থিতিশীলতা সমস্ত মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করছে তা ওই শ্রেণীর হেয়ালীপনা ও ভুল পরিচালনারই পরিণাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হচ্ছে, এ ধরনের লোকেই মুসলিম উম্মাহর ওপর কর্তৃত্ব করছে। যারা শুধু ঈমান ও কুরআনের ভাষা বুঝত, যাদের মধ্যে ঈমানী জোশ জাগ্রত ছিল, যারা দীনের জন্য উৎসর্গ হওয়ার বাসনা পোষণ করত এ সমস্ত সরল ধর্মপ্রাণ মুসলমান তথাকথিত ওই আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে আজ জিম্মি। পশ্চিমা ধাঁচে প্রণীত শিক্ষা কারিকুলাম শাসক শ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে অদৃশ্য এক দেয়াল সৃষ্টি করে দিয়েছে। যার কারণে সর্বত্র একটি অস্থিরতা ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। অনুৎপাদনশীল এই

শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের বুদ্ধি ও বিবেকের শক্তিকে এমন অহেতুক কাজে লাগিয়ে দিয়েছে, যা উম্মাহর কোনো উপকারে আসে না।

পাঁচ.

মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র প্রচলিত পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার চুলছেঁড়া বিশ্লেষণ করতে হবে। এর রগ-রেশায় বিচরণ করে তা ঢেলে সাজাতে হবে। মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা ও আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে মিল রেখে নতুন করে এমন শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে যার দ্বারা তাদের হৃতগৌরব ও হারানো ঐতিহ্য ফুটে ওঠে। মুসলমানদের জন্য প্রণীত শিক্ষাধারায় বস্তুবাদী দর্শনের কোন চিহ্ন থাকতে পারবে না।

শিক্ষার মৌল উপাদান নিছক জাগতিক উপকরণের ভিত্তিতেই নির্ণীত হবে না। কারণ, শিক্ষার সম্পর্ক মানুষের সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে ওৎপ্রোত। শিক্ষা মানুষের প্রকৃতিকে শালীন ও শৃঙ্খলিত করার যোগ্যতা রাখে। মানবসভ্যতার ইতিহাস বিশৃঙ্খলা, অস্থিতিশীলতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের অসম উপাখ্যানে ভরপুর। সুষ্ঠু ধারায় প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থাকে ভিত্তি করে মানুষের বুদ্ধি ও বিবেকের উপযুক্ত পরিচর্যা করা গেলে সাফল্যের দোড়গোড়ায় পৌঁছা সম্ভব। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার শুধুমাত্র আংশিক পরিবর্তন ও সাধারণ কাট-ছাঁটই যথেষ্ট নয় বরং এব্যাপারে যত ধরনের প্রক্রিয়া ও উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন তার সবটুকু গভীর চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে। সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করে মৌলিক চেতনা ঠিক রেখে সময় বিবেচনায় পূর্ণাঙ্গ একটি শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে। কেননা এটি ব্যতিরেকে মুসলিম বিশ্ব নিজের পায়ে দাঁড়ানো কিংবা নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও উদ্দেশ্যের সফল প্রয়োগ ঘটাতে পারবে না। এটা ছাড়া মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য থেকে যেমন বঞ্চিত হবে, তেমনি নিষ্ঠা ও নিবিড়ভাবে কাজ করারও সুযোগ পাবে না। প্রচলিত ধারার শিক্ষায় শিক্ষিত এমন কোনো নিষ্ঠাবান ব্যক্তি পাওয়া যাবে না যিনি ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ রূপদান এবং মুসলিম সোসাইটিকে স্বকীয়তা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপনের জন্য ইসলামের শাশ্বত শিক্ষা অনুযায়ী সরকারী অফিস, পাবলিক প্রতিষ্ঠান, বিচারালয় এবং প্রচার মাধ্যমগুলো পরিচালনা করছে। সুতরাং প্রচলিত শিক্ষাক্রম কোনক্রমেই মুসলিম উম্মাহর অনুকূলে নয়।

ছয়.

প্রচলিত ধারার শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের জন্য প্রথম পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও স্কলারদেরকে

ইসলামের অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। শিক্ষা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিশাল অবদানসমূহ তাদের সামনে তোলে ধরতে হবে। ইসলামী শিক্ষাধারায় জীবনের নতুন প্রাণ সঞ্চালন করে সভ্য দুনিয়ার সামনে তা স্পষ্ট করে তুলতে হবে যে, ইসলামের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনপ্রণালী সুউচ্চ ও শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী জীবনবোধ মানবপ্রকৃতির জন্য সবচেয়ে উপযোগী। এতে কখনও বিকৃতির কোনো সম্ভাবনা নেই। এর কার্যকারিতা ও সামর্থ্য কখনও কম-বেশি হয় না। মানুষের জীবনচলার প্রতিটি ধাপে ধাপে ইসলামের সফল দিকনির্দেশনা রয়েছে। ইসলাম মানুষের জীবন প্রবাহকে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌছে দেয়ার জন্য সার্বিক দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছে। মানবরচিত রীতি-নীতি থেকে এই ঐশী বিধান অনেক গুণ বেশি উপযোগী ও উৎকৃষ্ট।

সাত

মানবপ্রকৃতি ও জাতিসত্তার মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির বীজ অনেক গভীরে প্রোথিত। বিশেষ করে এমন জীবনব্যবস্থা যা দীনী গণ্ডিতে বিস্তৃত, যার গঠন প্রক্রিয়ায় ধর্মীয় ভাবধারা বিশেষ গুরুত্ব পায়, যার দর্শনে সংখ্যাগরিষ্ট জনসাধারাণের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে–এমন জীবনব্যবস্থা অথবা সংস্কৃতি থেকে কোনো জাতিকে পৃথক করা তাদেরকে জীবনের বিস্তৃত ময়দান থেকে দূরে সরিয়ে সংকীর্ণ ধর্ম বিশ্বাসে আবদ্ধ করে দেয়ার নামান্তর। এর দ্বারা বর্তমানকে অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। সুতরাং ইসলামী নেতৃত্ব ও মুসলিম সোসাইটির জন্য কর্তব্য হলো দক্ষতার সঙ্গে একটি সাংস্কৃতিক কাঠামো তৈরি করা যা পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণ, অপরিণামদর্শিতা এবং অনুভূতির দেউলিয়াত্ব থেকে পবিত্র হবে। রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায় থেকে নিয়ে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান, সমাজ, পরিবার, ব্যক্তি তথা জীবনের সকল পর্যায়ে বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর দ্বারা মুসলিম বিশ্বে শুধু ইসলামী জীবনধারার স্বপ্নিল নমুনাই উপস্থাপিত হবে না বরং ইসলামের নীরব এক তাবলীগও সাধিত হয়ে যাবে।

আট.

শিক্ষা ও চিন্তাধারাভিত্তিক পশ্চিমা সংস্কৃতি প্রযুক্তির উন্নয়ন ও জাগতিক উৎকর্ষের খাতিরে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা যেতে পারে। এর দ্বারা মুসলিম বিশ্বের চিন্তা ও গবেষণার নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হবে। ধর্মীয় ভাবধারা ও সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে এমন একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে হবে

যার ভিত্তি হবে ঈমান ও আখলাক, তাকওয়া ও ইনসাফ। এতে থাকবে সকল বিষয়ের পরিব্যাপ্তি। শক্তি ও সামর্থ্যের দিক থেকে তা হবে অদ্বিতীয়। ফলে এর প্রভাব পড়বে জীবনের সকল পর্যায়ে। জনসাধারণের মধ্যে পরিতুষ্টি আসবে। মোটকথা, পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে ওই সব জিনিস নেয়া যাবে যা মুসলিম জনসাধারণ, মুসলিম দেশ এবং মুসলিম শাসনের জন্য প্রয়োজন। কর্মের বিস্তৃত ময়দান আবিষ্কারের লক্ষ্যে পশ্চিমা ছাপমুক্ত যেকোনো সংস্কৃতি প্রয়োজনমাফিক গ্রহণ করাতে দোষের কিছু নেই। ভিন্ন সংস্কৃতির যা অপ্রয়োজনীয়, তা থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যমূলক। কেননা মুসলিম বিশ্ব যদি পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় গ্রহণ করার মুখাপেক্ষি হয়, তেমনি পশ্চিমা বিশ্বের জন্যও মুসলিম দেশসমূহ থেকে অনেক কিছু নেয়ার আছে। বরং এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, মুসলিম দেশসমূহ থেকে শেখা ও কিছু অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা পশ্চিমাদের জন্য একটু বেশিই বটে।

নয়.

মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে এমন দেশও রয়েছে যারা অতীতে ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতিতে বিশাল খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে যারা ইসলামের মৌল চেতনার বিলুপ্তি সাধন তথাকথিত 'প্রগতিশীল ইসলাম' বানানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত এবং ইসলামকে খণ্ডিত ও মনগড়াভাবে উপস্থাপন করছে তাদেরকে এটা বুঝতে হবে যে, এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, যা কোনো ইসলামী দেশে চলতে পারে না। ওই শ্রেণীকে বুঝানো প্রয়োজন যে, অসম্ভব ও স্বভাববিরোধী নিরর্থক এই কাজে নিজেদের সামর্থ্য ব্যয় না করে দেশ ও জাতির নানামুখী শত্রুদের মোকাবিলায় ব্যয় করলে তা স্বজাতির কল্যাণ সাধন করবে। যেসব দেশের জনগণ অধিকাংশ মুসলমান, শাসনকর্তৃত্ব যাদের হাতে তারাও ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক চলে, সেখানে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দীনী অনুভূতিকে কাজে লাগাতে হবে, যা ইসলামী বিধান চালু করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করার ফলে আল্লাহর সাহায্য ও বরকতের যে অঙ্গীকার তা ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে। এসব দেশে অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় হাই কমান্ড নির্ধারণ করতে হবে, যার ভিত্তি হবে ইসলামের পরামর্শভিত্তিক শাসনব্যবস্থা। পারস্পরিক মঙ্গল কামনা ও সহযোগিতার মানসিকতা বদ্ধমূল করতে হবে। অন্ততঃ নিজের মধ্যে এই সীমাবদ্ধতার উপলব্ধি থাকতে হবে যে, মুসলিম উম্মাহ আজ একক নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অথবা

ইসলামী খেলাফত যা প্রতিষ্ঠিত করা মুসলমানদের ওপর ফরজ ছিল, তা করতে না পারার দায়বোধ সব সময় মুসলমানদের ভেতরে জাগরূক রাখতে হবে।

দশ.

অনৈসলামিক দেশসমূহে ইসলামের দাওয়াত এবং ইসলামের সঠিক পরিচয় অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও কৌশলের মাধ্যমে তুলে ধরার প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে এমন নীতির অনুসরণ করতে হবে যাতে ইসলামের অমীয় সৌন্দর্যের শিক্ষা ফুটে ওঠে এবং সময়ের রুচি-বৈচিত্র্যও যেন বজায় থাকে। যেসব দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব হয়। জীবনকে ইসলামের আদলে এভাবে গঠন করতে হবে যেন তা অন্যকে আকৃষ্ট করে এবং অন্যদের অন্তর আসক্ত হয়। চারিত্রিক ও আত্মিক মূল্যবোধ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে ভালোভাবে বুঝাতে হবে। দেশকে বিপর্যয় ও দুর্যোগ থেকে বাঁচানোর জিম্মাদারী গ্রহণ করতে হবে। ইসলাম শুধু এই অবস্থায় নিজের প্রয়োজন ও যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে। এসব দেশেই মুসলমানরা নিজেদের দাওয়াতী খেদমত ও নেতৃত্বের ভূমিকা যথাযথ আদায় করতে পারে।

এগার.

শেষ পর্যায়ে এসে আমি আরজ করব, (এ বিষয়ে এটাই শেষ কথা নয়) ইসলামের প্রকৃতি, গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, সুষ্ঠ বিবেকের চাহিদা এবং মানবপ্রকৃতির সহজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি দাওয়াতী ও ঈমানী আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে অবশ্যই সর্বক্ষণ অব্যাহত থাকতে হবে। তবে তা হতে হবে ইতিবাচক উপায়ে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। দায়ীদের মধ্যে পৌরষদীপ্ত উঁচু হিম্মত, প্রসার দৃষ্টিভঙ্গির গুণ থাকতে হবে। যেসব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে অন্যায্য ও অন্যায়ভাবে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর ওপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো সৎ সাহস থাকতে হবে। তবে আল্লাহর পথের দাঈ'রা এসব গুণাবলীর ধারক হওয়া অথবা তাদের মধ্যে এসব গুণাবলী সৃষ্টি তখনই সম্ভব যখন তারা পূর্ণ বিশ্বাস ও নিটোল আস্থার সঙ্গে কোনো শক্তিশালী দাওয়াতী আন্দোলনে শরীক হবে। তাদের মধ্যে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে। মনুষত্যবোধ এই দীনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়–এটি ভালভাবে অনুধাবন করতে হবে।

ইসলামের দাওয়াতী আন্দোলনের জন্য কুরবানীর জযবা, উন্নত ধ্যান-ধারণা, অসাধ্যকে সাধন করার হিম্মত, কষ্টসহিষ্ণু জীবন গঠন এবং প্রয়োজনে জীবনের ঝুঁকি নেয়ার মতো প্রস্তুতি থাকতে হবে। কেননা মানবপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে

তারা ওই ঈমানকেই সমীহ করে যাতে সৎ সাহস আছে, ওই ব্যক্তিকেই সম্মান করে যিনি নিজের অস্তিত্বের ব্যাপারে আস্থাশীল। যার মধ্যে কামনা-বাসনার প্রতি নির্মোহতা এবং ধন-সম্পদের প্রতি নির্লিপ্ততা থাকে, যিনি নিজের ওপর ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত–মানবপ্রকৃতি তার প্রতিই আসক্ত হয়। সুতরাং দুর্বল ব্যক্তি বলবান মানুষের সম্মান করার জন্য প্রকৃতিগতভাবেই বাধ্য। গরীব লোক ধনীদের সম্মান করে, নিরক্ষর শিক্ষিতকে সমীহ করে, এমনকি দুর্বৃত্তও ভদ্রলোককে অন্তরে অন্তরে মর্যাদা দেয়। ইসলামের ইতিহাস বীরত্বের কীর্তিগাথা এবং বজ্রকঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার বিরল ঘটনায় ভরপুর। জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী মহল যারা বিভিন্ন জাতিসত্তার ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকেফহাল, যাদের অন্তর জীবিত–তারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নেতৃত্বের প্রতি ত্যক্ত-বিরক্ত, এদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে শুরু করেছে।

সবল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সাংস্কৃতিক অনিষ্টতা থেকে মুক্ত, ইসলামের শিক্ষা ও মূল্যবোধের ধারক–এমন কোনো ঈমানী ও দাওয়াতী আন্দোলনের অনুপস্থিতি ইসলামের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। সহীহ আকীদা এবং ইসলামী জীবনের জন্য বিরাট অন্তরায়। কেননা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অনিবার্য এমন কোনো জিনিসে সমস্যা সৃষ্টি হলে সে আর বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারে না।

সুতরাং দীনী ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমস্যার ফল এই দাঁড়াবে যে, অন্য কোনো আন্দোলন সামনে চলে আসবে যা গোমরাহীর দিকে ডাকবে। উদ্দেশ্য ও ফায়দাহীন বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর অসম্পূর্ণ ও নেতিবাচক আন্দোলন ধ্বংসের কারণ হয়। যারা ধর্ম, আন্দোলন এবং বিভিন্ন প্রকার দাওয়াতের বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন তারা জানেন যে, যখন কোনো শক্তিশালী বিশুদ্ধ আন্দোলনের কর্মসূচী সামনে না থাকবে তখন ভুল কোনো আন্দোলন এ স্থান দখল করে নিবে। যদিও কোথাও ভ্রান্তধারার সেই আন্দোলন কোনো সমস্যার মোকাবিলা করে বসে, কুরবানীর কিছু জযবা প্রদর্শন করে, নিজের ভিতকে বুলন্দ হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস চালায়, মুসলিম দেশসমূহ ইসলামী শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে অনাগত ফাসাদ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা করে, বড় কোনো শক্তিকে ঘটনাচক্রে সামান্য দমিয়ে দেয়, সস্তা শ্লোগানের মাধ্যমে জনসাধারণকে নিজেদের বশে নিয়ে আসে, প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে নিজেদের বিন্দুসম কৃতিত্বকে সিন্ধু করে উপস্থাপন করে। তাদের এই আন্দোলনের মোহাচ্ছন্ন কর্মসূচী জনসাধারণের ওপর যাদুর ক্রিয়া করে থাকে। আগ-পিছ না ভেবে সবাই গড্ডলিকা প্রবাহের মতো এর সঙ্গে ভেসে চলে। বিশেষত শিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত নতুন প্রজন্ম এর ওপর দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে। মুসলিম

রাষ্ট্রসমূহের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ড দেখে যারা ত্যক্ত-বিরক্ত তাদের মধ্যে এই আন্দোলনের যাদু এতই প্রভাব ফেলে যে, তা কোনো বক্তার বক্তৃতা, লেখকের লিখনি এবং যুক্তিবাদীর যুক্তি ও দর্শন দূর করতে পারে না।

প্রথম হিজরী শতকে খারেজীদের ইতিহাস, ৬ষ্ঠ ও ৭ম হিজরী শতকে সূফিবাদ ও ফেদাঈ আন্দোলনের ইতিহাস, হাসান বিন সাব্বাহ এর দর্শন এবং ইসলামের নামে সামরিক ও সংস্কারবাদী আন্দোলনের ইতিহাস-বিকৃত পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তনের দাবী নিয়ে যার উৎপত্তি, মিথ্যা ও প্রতারণার ঝাণ্ডা উড়িয়ে যা লোকদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিল; এমনিভাবে সমকালীন সংস্কার ও সামরিক আন্দোলনসমূহ যা ভুল গন্তব্যের দিকে ধাবমান এবং নিছক রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য হাজার হাজার তারুণ্যদীপ্ত যুবককে নিজেদের দলভূক্ত করে উৎসর্গিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করছে; এমনকি এরূপ অনেক দল ও মত যাদেরকে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক মনে করা হয় এবং যাদের চিন্তা-চেতনায় জাগরণ পরিলক্ষিত হয় তারাও এই উত্তাল প্রবাহে তৃণলতার মতো ভেসে গেছে। কুরআনী নির্দেশনা ও ইসলামী আকাইদের আলোকে যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন তাদের অনুভূত হয়নি। ইসলামের সঙ্গে সংশিষ্ট গোত্র ও দলসমূহকে ইনসাফের সঙ্গে পর্যালোচনা করার প্রয়াসও তারা চালাননি।

মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের কাছে একথা স্পষ্ট যে, একটি উত্তাল স্রোতধারাকে অন্য আরেকটি স্রোতধারাই রুখে দিতে পারে। একটি তুফানের মোকাবিলা করার জন্য এর থেকে শক্তিশালী আরেকটি তুফানের দরকার। মুসলিম বিশ্বে বর্তমান যে অবস্থা তাকে একটি নির্জীব বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা চলে। তারা আজ উচ্চবিলাস ও সুখনিদ্রায় বিভোর। তাদের মধ্যে শক্তিশালী কোনো ঈমানী দাওয়াত কার্যকর নেই। সহীহ আকীদা এবং পূঁত-পবিত্র উদ্দেশ্যে কুরবানীর জযবা তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামরিক দিক থেকেও তারা আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এ বিষয়টি সব সময়ই একটি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

নানা ধরনের ভ্রান্ত মতবাদ ও আন্দোলনের জালে যুব শ্রেণীকে আটকে দেয়ার জন্য ভূমি উর্বর করা হচ্ছে। কেননা যুবকেরা বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত নয়, তাদের সামনে বিশুদ্ধ কোনো কর্মক্ষেত্র নেই। তাই তারা ওই ভ্রান্ত আন্দোলনের ফাঁদে পা দিচ্ছে। কেননা সেখানে তারা এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করছে, যদিও তাদের আন্দোলনের অবস্থা হচ্ছে ওই মরীচিকার মত যার নকশা কুরআনে কারীমে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে 'যারা কাফের তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পীপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে।

এমনকি, সে যখন তার কাছে যায় তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অতঃপর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আন-নূর-৩৯)

যিনিই 'বর্তমান যুগে ইসলাম' এবং 'ইসলামের ভবিষ্যত' সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, যাদের কাছে আকীদার বিশুদ্ধি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানের মর্যাদা ও দীনী শিক্ষা প্রিয় হয় তাদেরকে এই বাস্তবতা সামনে রাখা উচিত। আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা কুরআনের একটি আয়াতের মাধ্যমে সমাপ্ত করব যাতে আল্লাহ তাআলা আনসার ও মুহাজিরদের প্রথম শ্রেণীর অল্প কিছু লোককে সম্বোধন করেছেন। যাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে সমস্ত দুনিয়া এবং মানবতার যোগসূত্র কায়েম করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন 'যদি তোমরা তা না কর তবে জমিনে বড় ধরনের ফেতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে।' (সূরা আনফাল-৭৩)

আধুনিক সভ্যতার ব্যর্থতা

আমি আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে আলোকপাত করব, আপনাদের প্রতি অনুরোধ হলো—আপনারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিষয়টি অনুধাবন করবেন এবং চিন্তা করবেন। যদি আপনার মন-মগজে বিষয়টি কোনো ক্রিয়াপাত করে তবে আপনারা বিষয়টি অন্যের কাছে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করবেন। আমি এবং আমার কাফেলা এ শহরে এসেছি, আপনি একথা জিজ্ঞেস করার অধিকার রাখেন যে, অনাহুত এই আগমন কেন, কোন অনুভূতিতে আপনি এখানে এসেছেন? আপনি অবশ্যই ধারণা করে থাকবেন যে, এ কাফেলা শহরে শহরে ফেরি করে বেড়ানোর পেছনে অবশ্যই কোন উদ্দেশ্য আছে। আমরা আপনাদের সামনে আমাদের দরদ ও ভালবাসা পেশ করছি, আমরা আপনাদেরকে আমাদের সঙ্গী করতে চাই।

উপকরণের সহজলভ্যতা ও নিঃসঙ্গতা

এ সময়টি নানা দিক থেকে অনেক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কাজের উপকরণ ও ক্ষেত্র বর্তমানকালে যত সহজলভ্য ততটা ইতোপূর্বে কখনো ছিল না। আমি ইতিহাসের একজন ছাত্র। আমি জানি এত উপকরণ মানবতার কাছে ইতোপূর্বে আর কখনো জমা হয়নি। উপায় ও উপকরণের সমৃদ্ধি বর্তমানকালের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বর্তমানের উপায়-উপকরণ অধিক থেকে অত্যধিক ও উত্তম থেকে উত্তম। আমরা লক্ষ্ণৌ থেকে কয়েক ঘন্টার সফরে এখানে পৌছে গেছি। এর চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন গাড়ি দিয়ে এ সফর করা যেতো। বিমানেও এখানে আসা যায়। আজ থেকে ৭০-৮০ বছর পূর্বেও যদি কেউ লক্ষ্ণৌ থেকে বেনারসে আসতে চাইতো তাহলে সে কী উপায় অবলম্বন করতো, আপনি চিন্তা করুন! ভেবে দেখুন, এ পর্যন্ত পৌছতে তার

কী পরিমাণ সময় ব্যয় হতো। এটা গেল সফরের বিষয়। একটি সময় ছিল যখন মানুষ দূর-দুরান্তের প্রিয়জনদের কুশলাদি জানতে প্রমাদ গুণতো।

কিন্তু বর্তমানে এক দেশ থেকে আরেক দেশের লোকের গলার স্বর আমরা ঘরে বসে শুনতে পারি এমন স্পষ্টভাবে যে, যেন সরাসরি কথা বলছে। বর্তমানে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে মাত্র কয়েক দিনে চিঠি পৌছে যায়। টেলিবার্তা এর চেয়েও আগে পৌছে। আগের যুগে কেউ বিদেশে গেলে তার ফিরে আসাটা ছিল সন্দেহাবৃত। রওয়ানা হওয়ার সময় তাই মাফ চেয়ে নিত। যদি প্রবাস থেকে কয়েক বছর পর অন্য কেউ ফিরে আসতো এবং প্রবাসী ব্যক্তির খবরা-খবর জানতো, তখন আত্মীয়-স্বজন শোকরিয়া আদায় করতো। অন্যথায় সাধারণত ভালো কোনো খবর মিলত না। কিন্তু আজ যত দূরের সফরের ইচ্ছাই করা হোক সে যেকোনো স্থান থেকে নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে পারছে। অনেক সহজে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বাড়ি প্রত্যাবর্তন করতে পারছে। বর্তমান অবস্থা হচ্ছে, লন্ডনে অবস্থানরত কোন ব্যক্তির আওয়াজ এখানে বসে শুনতে পারছেন। নিউইয়র্কে হয়তো কেউ বয়ান করছে, ভাষণ দিচ্ছে, আপনি এখানে বসে সরাসরি তার কথা শুনতে পারছেন। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে এ ধরনের কথা বললে তা বুঝানোও মুশকিল হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু আজ যদি আধুনিক আবিষ্কারসমূহ সম্পর্কে আপনি কোন সন্দেহ পোষণ করেন তবে একটি ছোট বাচ্চাও হাসবে। টেলিফোন, টেলিভিশন, ওয়ারল্যাস, রেডিও এবং বিভিন্ন প্রকার আবিষ্কারের প্রতি একটু নজর করে দেখুন, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদেরকে কত উপকরণ দান করেছে।

আমার অন্তরে বারবার এ আফসোস ও আকাজ্ক্ষা ঘুরপাক খায় যে, যদি এ সময়ে কখনো ভাল হওয়ার কামনা, আল্লাহভীরু হওয়ার বাসনা, নরম দিল, সহমর্মিতাবোধ এবং পরস্পরে ভালবাসাও হতো এবং এসব উপকরণ সঠিক পন্থায় কাজে লাগানো যেতো; তবে দুনিয়া জান্নাতের উৎকৃষ্ট নমুনা হয়ে যেতো। আমার দিলে থেকে থেকে একটি বেদনাবোধ জাগ্রত হয় যে, কর্মের উপকরণের এত আধিক্য কিন্তু এই উপকরণ দ্বারা যারা কাজ করবে তাদের মধ্যে বিরাজ করছে এত দুর্ভিক্ষ! বর্তমানে আপনাকে কোনো উপকরণ তালাশ করতে হবে না, উপকরণ আপনাকে খুঁজে বের করবে। এখন যানবাহনই মুসাফিরকে খুঁজে বের করে, মুসাফিরের মুখোমুখি হয়। আজকাল রেলগাড়ির সময় প্রচার করা হয়, যাত্রার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে মনোরম স্থান এবং ঐতিহাসিক শহরের দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়। উদ্দেশ্য ভ্রমণের প্রতি লোকদেরকে আগ্রহী করে তোলা। বর্তমানে এয়ারলাইন্সগুলো বিজ্ঞাপন দেয়। স্টেশনে গাড়ী থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে হোটেলওয়ালাদের সাক্ষাত পাওয়া যায়। কখনো কখনো তারা এমনভাবে পেছনে লাগে যে, তাদের থেকে ছুটা মুশকিল হয়ে পড়ে। একটি

সময় ছিল যখন মুসাফির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে যানবাহন ও আশ্রয়স্থল তালাশ করতে হতো। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি পুরোপুরি উল্টো।

উদ্দেশ্যে সততার অনুপস্থিতি

কিন্তু যে দ্রুততায় উপায়-উপকরণ উৎকর্ষ লাভ করছে, আমাদের চরিত্র ও মনুষ্যত্ব সে হিসেবে উন্নতি সাধন হয়নি। একজন মানুষকে এটা দেখে দুঃখ লাগে যে, প্রথমে মানুষের মধ্যে পরোপকারের স্পৃহা ছিল, তখন তার কাছে উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য ছিল না। আর বর্তমানে উপায়-উপকরণ প্রশস্তি লাভ করেছে, কিন্তু পরোপকারের স্পৃহা তাদের অন্তর থেকে মুছে গেছে। আমি এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ দিচ্ছি। আগের যুগে দরিদ্র পরিবারের কোনো লোক কামাই-রুজির জন্য বিদেশে যেতো। সে যা কিছু রোজগার করতো তা তার বাড়িতে পাঠানো মুশকিল ছিল। তার নিজেকেই যেতে হতো অথবা ভাগ্যক্রমে যদি কোনো বিশ্বস্ত লোক মিলে যেতো। তাকে সবসময় একটা অস্থিরতায় থাকতে হতো। পরিবারের লোকদের কষ্ট, সন্তানের ক্ষুধা এবং তাদের কান্নার কথা সব সময় স্মরণে আসতো, কিন্তু করার কিছুই ছিল না। ডাক বিভাগও ছিল না, আদান-প্রদানের কোনো সহজ মাধ্যম তাদের সামনে খোলা ছিল না। কিন্তু বর্তমানে প্রতিটি শহরে হাতের কাছেই ডাকঘর। মানি অর্ডারের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে পারে। তারের মাধ্যমেও দ্রুত টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু আফসোসের কথা হচ্ছে, উপার্জনকারীদের অন্তরে টাকা প্রেরণের বাসনা এবং পরিবারের দুঃখ-কষ্টের কোনো অনুভূতিই বাকী নেই। সিনেমা, বিনোদনকেন্দ্র, খেল-তামাশা, হোটেল-রেস্টুরেন্ট ইত্যাদির প্রয়োজন চুকিয়ে কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না যা বাড়িতে পাঠাবে। ডাক বিভাগের কাজ তো হচ্ছে কেউ যদি টাকা পাঠায় তবে উদ্দীষ্ট ব্যক্তির কাছে টাকা পৌছে দেয়া। কিন্তু যদি টাকাই না পাঠায় তবে ডাক বিভাগের করার কিছু নেই। নৈতিক শিক্ষা ও ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করা ডাক বিভাগের দায়িত্ব নয়।

আগেকার লোকেরা নিজের পেট ভরার ধান্ধা না করে সব উপার্জন গরীব-দুঃখী-অসহায়দের কাছে পাঠিয়ে দিত। আর বর্তমানে সাহায্য পাঠানোর সব উপায়-উপকরণ মজুদ থাকা সত্ত্বেও গরীব-অসহায়দেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার স্পৃহা জাগ্রত নেই। দানের বাসনা লুপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের সংস্কৃতিতে এর কোনো উল্লেখই নেই। তবে উপায়-উপকরণের এ প্রাচুর্যতা কি কাজে আসল?

কেবল উপকরণের সহজলভ্যতা ভালো মনোবৃত্তির পরিচায়ক নয়

বর্তমানে উপায়-উপকরণসমূহ নেক স্পৃহা, উত্তম মনোবৃত্তি এবং বাঞ্ছিত আচরণের পরিচায়ক নয়। মানি অর্ডার, টেলিবার্তা আছে, যোগাযোগ অতি সহজ, সম্পদেও প্রাচুর্য আছে; কিন্তু এর কী মহৌষধ হতে পারে যে, গরীব-দুঃখীদের সাহায্য-সহযোগিতা এবং পরোপকারের প্রেরণা অন্তর থেকে একদম দূর হয়ে গেছে। দুনিয়ার কোনো প্রতিষ্ঠান এ মনোবাঞ্ছা পুনঃজাগ্রত করতে পারবে? এমতাবস্থায় উপায়-উপকরণ কী সাহায্য করতে পারে?

আমি এ বিষয়টির অন্য আরেকটি উদাহরণ দিয়ে থাকি। আমি পুরোনো কিতাবাদি ঘাটাঘাটি করে দেখেছি, আল্লাহর বড় বড় নেক বান্দা এ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন যে, আল্লাহ তাদেরকে যেন হজ্জ নসীব করেন। তারা তাদের ব্যাকুল অন্তরের আকুল অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে শত সহস্র শে'র, প্রেমকাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু তাদের দেলের এ তামান্না পূরণ হয়নি। কারণ তাদের কাছে হজ্জের সফরের সমপরিমাণ পয়সাও ছিল না, আর সফরও এত সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। মনে করুন, কারো কাছে প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা আছে, সফরের সব সরঞ্জামও মজুদ কিন্তু হজ্জের কোন বাসনা দেলে নেই, বলুন, এসব উপকরণ কী করতে পারবে? তীর্থস্থান ভ্রমণ করার জন্য লোকেরা হাজার মাইল পায়ে হেঁটে আসত, সফরের অমানুষিক কষ্ট সহ্য করত। বর্তমানে সফরের অতি সহজলভ্য, দ্রুতগামী যানবাহন আবিস্কৃত হয়েছে, কিন্তু সফরের আকাঙ্ক্ষা ও জযবা নেই, তাহলে এই উপকরণের লাভটা কী?

উপায়-উপকরণের পূর্বে ব্যবহারকারী দরকার

পয়গাম্বরদের একথা জানা ছিল যে, উপায়-উপকরণের পূর্বে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার মতো লোকের প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঈমানী প্রজ্ঞা ও নবুওয়াতী নূর দান করেছিলেন। তাঁরা উপায়-উপকরণ তৈরি করার পূর্বেই এর সঠিক প্রয়োগকারী তৈরি করেছিলেন। সওয়ারী তৈরির পূর্বেই এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার এবং নেক মাকসাদে প্রয়োগকারী লোক তৈরি করেছিলেন। টাকা-পয়সা উপার্জন করার পূর্বে তা যথাযথ ও সঠিক পন্থায় ব্যয় নির্বাহক জন্ম দিয়েছিলেন। উপায়-উপকরণ আবিষ্কারের পূর্বে নিজের শক্তি-সামর্থ্য এবং আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতরাজির সঠিক ব্যবহার শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরা মানবতার মধ্যে নেকস্পৃহার বীজ ঢেলে কুপ্রবৃত্তির মূলোৎপাটন করেছিলেন। একীন ও আকীদা দ্বারাই এটা সৃষ্টি হয়েছিল। একীন স্পৃহার জন্ম দেয়। স্পৃহা আমলের ইচ্ছা সৃষ্টি করে। আর আমল উপায়-উপকরণ দ্বারা কার্য আঞ্জাম দেয়। উপায়-উপকরণ এবং মানবিক প্রচেষ্টার ফলাফল সবসময়ই মানুষের ইচ্ছার অনুগত হয়ে থাকে।

নেক কাজের ইচ্ছা জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি ও সম্পদ। কিন্তু দুনিয়ার বড় বড় দার্শনিক, জ্ঞানী-গুণী এ তীক্ষ্ণ বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ। এটা শুধু আল্লাহর দিক নির্দেশনা এবং পয়গাম্বরদের অন্তর্দৃষ্টির ফলাফল যে, তাঁরা প্রথমে মানুষের মধ্যে ভাল কাজের স্পৃহা সঞ্চার করেছেন। নিজে ভাল মানুষ হওয়া, অন্যের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন এবং সত্য ও ন্যায়ের অবলম্বনকারী বানিয়েছেন। উপায়-

উপকরণ ছিল তাদের পদতলে, তাদের চাহিদা ও বাসনার অনুগামী। তাদের চিন্তা-ধারা কখনো সঠিক নির্দেশনা থেকে বিচ্যুত হতো না। তাঁরা মানুষের দিল তৈরি করত, মগজ গঠন করত। আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলেরা দুনিয়াকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি দেননি, দিয়েছেন শুধু মানুষ, আর মানুষই এই দুনিয়ার মূল অর্জন।

নবী-রাসূলেরা মানুষ গড়েছেন

নবী-রাসূলগণ এমন মানুষ তৈরি করেছেন যারা প্রবৃত্তিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা বস্তুগত উপকরণকে নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে ব্যবহার না করে মানবতার খেদমতে নিয়োজিত করেছিলেন। তাদের হাতে এমন উপকরণও বিদ্যমান ছিল যা দ্বারা দুনিয়ার যেকোনো ভোগ বিলাস তারা করতে পারতো, কিন্তু তারা তা করেননি। শাহী জীবন-যাপন করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তারা অল্পেতুষ্টি ও নিয়ন্ত্রিত জীবন অবলম্বন করেছিল। হযরত ওমর রা. এর কাছে এমন উপকরণ ছিল যা দ্বারা তিনি ইচ্ছে করলে রোম-পারস্যের সম্রাটদের মতো ভোগ-বিলাসী ও স্বাচ্ছন্দময় জীবন যাপন করতে পারতেন। ইরানের সম্রাটের মতো চাকচিক্যময় জীবন অবলম্বনের সুযোগ তাঁর হাতের নাগালেই ছিল। হযরত ওমর রা. এর পদতলে ছিল রোম-পারস্য সাম্রাজ্য, ইরান শাহীর রাজত্ব। মিশর ও ইরাকের মতো ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র ছিল তাঁর হাতের মুঠোয়। হিন্দুস্তানের অতি নিকটে চলে এসেছিল তাঁর বাহিনী। এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ এলাকাই ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণে। এমন ক্ষমতাধর ব্যক্তি যদি আরাম-আয়েশ করতে চাইত তবে তাঁর কিসের কমতি ছিল? কিন্তু তিনি এই বিশাল সাম্রাজ্য, অফুরান উপকরণ দ্বারা ব্যক্তিগত কোনো ফায়দা হাসিল করেননি। তাঁর সাদসিধে ও অনাড়ম্বর জীবনের চিত্র এই ছিল যে, তিনি দুর্ভিক্ষের সময় ঘি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। তেল খেতে খেতে তাঁর গায়ের ঝকঝকে ফর্সা রং শ্যামলা হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর নিজের ওপর এত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিলেন যে, লোকেরা বলাবলি করতো, যদি এ দুর্ভিক্ষ দ্রুত শেষ না হয় তবে ওমর রা. বাঁচবে না।

তাঁর নামেই হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. তাঁর চেয়েও বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁর অবস্থা ছিল–ঠাণ্ডার দিনে সাধারণ জনগণের জন্য সরকারিভাবে পানি গরম করার যে ব্যবস্থা ছিল তা দ্বারা গোসল করাকেও নিজের জন্য উচিত মনে করতেন না। এক রাতে তিনি রাষ্ট্রীয় কাজ করতেছিলেন। এক ব্যক্তি আসল এবং তাঁর কুশলাদি জানতে চাইল। তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়ে আলোচনা শুরু করে দিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাতিটা নিভিয়ে দিলেন। কারণ ওই বাতিতে ছিল রাষ্ট্রীয় তেল, আর তাদের আলোচনা ছিল রাষ্ট্রীয় বিষয়ের বাইরে। তিনি রাষ্ট্রীয় তেল খরচ করে ব্যক্তিগত বিষয়ে

আলোচনা করতে চাইলেন না। তিনি যদি ভোগ-বিলাসী জীবন অবলম্বন করতে চাইতেন তবে সমস্ত দুনিয়ার ভোগ বিলাস তাঁর কাছে হার মানত। কেননা সর্বপ্রকার উপকরণের মালিক ছিলেন তিনি। ওই সময়কার সভ্য দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন তিনি। এটা ছিল নবী করীম সা.এর মহান শিক্ষা, সর্ব প্রকার উপায়-উপকরণ তাদের আনুকূল্যে থাকা সত্ত্বেও সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবনে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি।

সভ্যতার ধ্বজাধারী ইউরোপের উদ্দেশ্যের বিসর্জন

বর্তমানে ইউরোপের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এবং নিস্পৃহতা হচ্ছে তাদের কাছে উপায়-উপকরণের সুবিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। কিন্তু ভাল কাজের স্পৃহা ও সৎ মনোবৃত্তি অনুপস্থিত। তারা একদিকে উপায়-উপকরণে কারুণ সদৃশ, অন্যদিকে সৎ উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে নিতান্তই নিঃস্ব ও অসহায়। তারা বিশ্বের তাবৎ ভেদ উদঘাটন করে ছেড়েছে, কৃত্রিম শক্তিকে নিজেদের দাস বানিয়েছে, গভীর সমুদ্র ও আকাশের শূন্যতায় পর্যন্ত তাদের কর্তৃত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু তারা তাদের প্রবৃত্তি ও নফসের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারেনি। সমগ্র বিশ্বের সমস্যার সমাধান তাদের নখদর্পনে, কিন্তু নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে পারেনি, এর গতিবিধি টের পায়নি। তারা বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণু এবং কৃত্রিম শক্তিকে বিন্যস্ত ও সুগঠিত করেছে, বস্তুগত জীবনে বিপ্লব সাধন করেছে, কিন্তু তারা তাদের নিজেদের বিক্ষিপ্ততা ও লক্ষ্যহীনতা দূর করতে পারেনি। কবির ভাষায় 'সূর্যের কিরণকে যারা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে, জীবনের অমানিশার রাত্রিতে উষার ঝলক তারা আনতে পারেনি। আকাশের তারকার বন্ধনে যারা সৌরজগত মন্তর করেছে, চিন্তার ভুবনে তারা নিজেদের সফর নিশ্চিত করতে পারেনি।' হায়! যদি তাদের কাছে এত উপায়-উপকরণ না হয়ে সৎ মনোবৃত্তি এবং মানবতার সেবার স্পৃহা জাগরূক থাকত!

উপকরণ ধ্বংসের কারণ কেন?

মস্তিষ্কের বিকৃতি এবং নিয়তের অসাধুতা এসব উপকরণকে মানবতার জন্য ভয়ঙ্কর বানিয়ে দিয়েছে। কোনো নির্মম-নিষ্ঠুর অত্যাচারী লোকের কাছে যদি ধারালো ছুরি থাকে তবে সে বেশি ক্ষতি করবে, আর যদি ভোঁতা ছুরি থাকে তবে এত ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। সভ্যতা উৎকর্ষ লাভ করেছে কিন্তু মানবতার আচরণ উন্নত হয়নি, ফলে নব আবিস্কৃত উপায়-উপকরণ মানুষের জন্য প্রাণঘাতি রূপ ধারণ করেছে। দ্রুতগামী যানবাহন অত্যাচারের মাত্রাও দ্রুত করেছে, অত্যাচারীদেরকে চোখের পলকে এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে পৌঁছে দিচ্ছে। আগেকার জালেমেরা গরুর গাড়িতে চড়ে যেতো এবং জুলুম করতো,

যেহেতু পৌঁছতে দেরি হতো এজন্য স্বাভাবিতভাবেই জুলুমটাও দেরিতেই হতো। ফলে দুর্বলদের নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগ হতো এবং কিছুদিন আরামে থাকতে পারতো। সময় অভাবনীয় উন্নতি করেছে, আজ জালেমেরা দ্রুতগামী যানবাহনে চড়ে অতি সহজে মুহূর্তের মধ্যে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। আর দুর্বল, অসহায় জাতিসমূহকে দুমড়ে মুচড়ে চালিয়ে যাচ্ছে নির্যাতনের স্টিম রোলার। 'টু' শব্দ করার সময়টুকুও তাদের দিচ্ছে না।

আধুনিক সভ্যতার চরম ব্যর্থতা

ইউরোপ-আমেরিকার বড় বড় দার্শনিক-চিন্তাবিদেরা আজ অকপটে একথা স্বীকার করছে যে, আধুনিক সভ্যতা উপায় উপকরণ সৃষ্টি করেছে কিন্তু এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিরূপণ করতে পারেনি। উদ্দেশ্যহীন উপায়-উপকরণ ফায়দাশূন্য। আমরা এশিয়াবাসী ইউরোপীয়দের এ কথা বলতে পারি যে, তোমাদের আবিস্কৃত উপায়-উপকরণ, চোখ ধাঁধানো উৎকর্ষ ও তত্ত্ব সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এর দ্বারা কোনো উদ্দেশ্যই বাস্তবায়ন হয়নি। তোমাদের তাহযীব, জীবন দর্শন, জীবনবোধ, উন্নতি-অগ্রগতি–সৎ উদ্দেশ্য এবং ইতিবাচক স্পৃহা সৃষ্টি করতে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। তোমরা ভালো ভালো কাজের উপকরণ নিছক সৃষ্টিই করতে পারো কিন্তু ভালো কাজের স্পৃহা জাগাতে পারো না। কারণ উত্তম স্পৃহার সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে, আর তোমাদের উপকরণ ও আবিষ্কারের সেখানে কোনো প্রবেশাধিকার নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সৎ কাজের স্পৃহা প্রাধান্য না পাবে ততক্ষণ উপকরণ ও সম্ভাবনা কোনোই কাজে আসবে না। সৎ কাজের প্রবণতা এবং এর তীব্র চাহিদা সৃষ্টি করা নবী-রাসূলদের কাজ। আর তাদের মহান শিক্ষা এখন পর্যন্ত এর একমাত্র মাধ্যম। তাঁরা ব্যাপকভাবে এটা সৃষ্টি করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। লাখো মানুষের অন্তরে সৎ কাজের স্পৃহা, খেদমতের জযবা এবং জুলুম ও মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারা তাদের সীমিত উপকরণ দিয়ে এসব কাজ করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, যা আজ বিশাল উপকরণ দ্বারাও হচ্ছে না।

ধর্মের যা করণীয়

অনেকেই মনে করে থাকেন, বর্তমান যুগে ধর্মের কাছে কোনো পয়গাম নেই। এ যুগে ধর্ম কোনো অবদান রাখতে পারবে না। কিন্তু আমি এটা অস্বীকার করি এবং চ্যালেঞ্জ করে বলি–ধর্ম আজও ইউরোপের পথপ্রদর্শন করতে সক্ষম। একমাত্র সহীহ এবং শক্তিশালী ধর্মই সৎ কাজের মনোবৃত্তি ও নেক আমলের স্পৃহা সৃষ্টি করতে পারে, আর এটাই জীবনের চাবিকাঠি। বর্তমানে দুনিয়া বড়ই বিক্ষিপ্ততা ও বিচ্ছিন্নতায় পতিত। ইউরোপের কাছে উপায়-উপকরণ আছে,

নেই শুধু উদ্দেশ্য ও মাকসাদ। যদি উপায়-উপকরণ এবং উদ্দেশ্য ও মাকসাদের সমন্বয় সাধন হতো তবে দুনিয়ার চিত্রই পাল্টে যেতো।

উপকরণের আধিক্য রাষ্ট্রসমূহকে গোলাম বানিয়ে দিয়েছে

আধুনিক সভ্যতা এত অধিক উপকরণ আবিষ্কার করেছে যে, এর কোনো প্রয়োগ ক্ষেত্র নেই। উপকরণই তার প্রয়োগস্থল অন্বেষণ করছে। আর এই অন্বেষণ জাতিসমূহকে গোলাম এবং রাষ্ট্রসমূহকে ব্যবসায়িক পণ্য বানাতে প্রবঞ্চিত করছে। কখনো কখনো এর জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন পড়ে। যেন নতুন নতুন আবিষ্কৃত অস্ত্রসমূহের প্রয়োগ ঘটে। বিভীষিকাময় এসব যুদ্ধের ভিত্তি স্থাপন করেছে সেই সব অস্ত্র আবিষ্কারকরা যারা তাদের অস্ত্রের কাটতিটাকেই বড় করে দেখে। আজ কাপড়, জুতো এবং সব ধরনের শিল্পেরই ব্যাপক উন্নতি সাধন হচ্ছে, কিন্তু এগুলোর পর্যাপ্ত ক্ষেত্র নেই। এই সভ্যতা উপায়-উপকরণের ভারে নুজ্য কিন্তু চারিত্রিক শক্তি এবং বিশ্বাসের ন্যূনতম আলোও তাদের কাছে নেই।

এশিয়ার কর্তব্য

এশিয়াবাসীর দায়িত্ব ছিল, তারা ইউরোপের পণ্যের কাটতিস্থল না হয়ে, ইউরোপের উপায়-উপকরণের প্রতি মোহগ্রস্ত না হয়ে এই নাজুক মুহূর্তে ইউরোপের সাহায্য করা। তাদেরকে উন্নত চরিত্রের শিক্ষা দেয়া। তাদের মধ্যে ঈমান ও বিশ্বাসের আলো এবং চারিত্রিক উৎকর্ষের স্পৃহা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো। কেননা তাদের (এশিয়াবাসীর) কাছে আছে ধর্মের ঐশী শক্তি। ইউরোপ শত শত বছর পূর্বেই এ সম্পদ থেকে মাহরূম হয়ে গেছে। কিন্তু আফসোস! এদেশ নিজেই চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং মানবিক উন্নত গুণাবলীর ক্ষেত্রে দেওলিয়া হতে চলেছে। এসব দেশেই আত্মবিস্মৃত ও লক্ষ্যচ্যুতির হাওয়া বইতে শুরু করেছে, সম্পদ উপার্জনের এক পাগলা ঘোড়া পেয়ে বসেছে তাদের। এসব দেশের সমাজব্যবস্থায় নিস্প্রভতা লেগেছে–এটাই এতদ অঞ্চলের জন্য আশঙ্কার বড় কারণ। এর চেয়েও ভয়ঙ্কর হচ্ছে, দেশের কোনো প্রতিষ্ঠান, কোনো দল-গোষ্ঠী এ আশঙ্কাটুকু অনুভব পর্যন্ত করছে না। চারিত্রিক সংশোধন, ঈমান ও বিশ্বাসের প্রচার-প্রসার এবং সুশীল কাঠামো গড়ার কোনো দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছে না। অথচ এটাই ছিল সর্বপ্রধান দায়িত্ব, কারণ প্রত্যেক গঠনমূলক কাজের পূর্ণতা এর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সময়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ

একাজ সারা বছরের জন্য যথেষ্ট। আমি এই আশা নিয়ে আমার কথা উপস্থাপন করছি যে, হয়ত কোনো জাগ্রত মস্তিষ্ক, চেতন অন্তর, সুস্থ প্রকৃতির মানুষ আমার কথার ওপর আমল করবে। আমার বক্তব্য এটাই যে, নবী-রাসূলদের

পথ অনুসরণ করুন। আল্লাহর মহান সত্তা এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুন। আল্লাহর আনুগত্যকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন বানিয়ে নিন। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা জ্ঞান, সম্পদ এবং যাবতীয় উপকরণ দান করেছেন তারা দুনিয়াতে সৎভাবে জীবন-যাপনের চেষ্টা করুন। জানা এবং মানার মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যতা তৈরি করুন। উপকরণ ও উদ্দেশ্যের সমতা এবং ইলম ও আখলাকের মধ্যে সম্পর্ক কায়েম না হলে কিসের মনুষ্যত্ব? দুনিয়া এভাবেই ধ্বংস হয়ে যাবে। উপায়-উপকরণ আপনাকে ইউরোপের সঙ্গে মিলাতে পারে। এগুলো অবলম্বন করা থেকে আমি কাউকে নিষেধ করছি না। কিন্তু উদ্দেশ্য, সৎ মনোবৃত্তি এবং স্পৃহা আপনাকে এক নবী-রাসূলের সঙ্গেই মিলাতে হবে। আর আপনার জন্য এ থেকে সব সময় ফায়দা হাসিলের সুযোগ থাকে। এর থেকে বিশ্বাসের সম্পদ, সৎ কাজের স্পৃহা নিয়ে আপনি আপনার জিন্দেগীটাকেও গঠন করতে পারেন এবং ইউরোপকেও ধ্বংসের করুণ পরিণতি থেকে বাঁচাতে পারেন।

বর্তমান বিশ্বের টানাপোড়েন ও এর প্রতিকার

বর্তমান সময়ে দুনিয়ার বিভক্তি খুবই নির্দয়ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। আগের যুগে রাজা-বাদশারা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের রাষ্ট্রকে ভাগ করত। কিন্তু বর্তমান যুগের রাজনৈতিক দর্শন জাতি ও দেশকে ভাগ করে দিচ্ছে। ধর্মীয় ভিন্নতা এত বড় ফিতনা ছিল না যা আধুনিক সভ্য দুনিয়া ও গণতান্ত্রিক যুগে নজরে আসছে। বর্তমান যুগের রাজনৈতিক প্লাটফর্ম লোকদের মধ্যে বিভক্তি ও দলাদলি বাড়ানোর ক্ষেত্রে লিপ্ত। তবে নির্লোভ হয়ে ডাকা হলে লোকেরা এখনও এ ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য প্রস্তুত। রাজনৈতিক প্লাটফর্ম ছাড়াও লোকজন একত্র হতে পারে। আমরা লোকদেরকে শুধু মানবিক সমস্যাবলীর ব্যাপারে চিন্তা করার দাওয়াত দেই, এতে আমাদের অন্তর অনেক খুশি হয়ে যায় যে, লোকেরা আমাদের দাওয়াত কবুল করেছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যাপারে আমাদের ঘাবড়িয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। মানুষ তার অভিজ্ঞতার দ্বারাই ফল বের করে নেয়। মানুষ যে জিনিস থেকে বারবার ফায়দা হওয়া দেখে সেটাকে নিয়ম হিসেবে ধরে নেয়। বর্তমানে পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে একত্রিত করা প্রায় নিয়মে পরিণত হয়েছে। আপনারা আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন, আমি কোনো পার্টির মাউথপিস কিংবা লাউড স্পিকার নই। আমাদের সামনে একমাত্র উদ্দেশ্য মানবতাকে নিয়ে চিন্তা করা, তাদের সম্পর্কে একটু ভাবা।

নেতৃত্বের হুঁশ

বর্তমান সময়ে মানুষ আসল সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু বলছে, সব ঠিক মতোই চলছে। তবে সবকিছু আমার মন মতো হতে হবে, আমার নেতৃত্বে ও

কর্তৃত্বের অধীনে থাকতে হবে । চরিত্রহীনতা, অকৃতজ্ঞতা, চৌর্যবৃত্তি এবং সম্পদ আহরণের হুঁশ ঠিকই আছে, নির্বিঘ্নে এসব করতে পারলে খুবই ভাল । আজ প্রত্যেক দিলের তামান্না এটাই । যখনই কারো হাতে কর্তৃত্ব আসে সে লুটে-পুটে সে নেজামই কায়েম রাখে, পূর্বের অবস্থানকেই সেও ধরে রাখে । প্রকৃত সমস্যা নিরূপনের প্রশ্নে পার্টিগুলোর মধ্যে মৌলিক কোন তফাৎ নেই । কেউই একথা বলে না যে, যা কিছু হচ্ছে এগুলো হওয়া উচিত নয় । সবারই কাম্য একটাই, ভাল-মন্দ যা কিছু হচ্ছে আমাদের অধীনে হোক, তবেই সবকিছু ঠিক । বিষয়টি এমন হলো যে, কারখানা ভুল এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই বরং রাগ হচ্ছে এজন্য যে, আমাদের ছায়া এর মাথার উপর নেই ।

বিশ্বযুদ্ধসমূহের হাকিকত

বিশ্বের বড় বড় যুদ্ধসমূহ এ ভিত্তির ওপরই সংঘটিত হয়েছে । ফ্রান্স, বৃটেন, জার্মানী, রাশিয়া, আমেরিকা এর সবগুলোই এ স্পৃহা ধারণ করে আছে । তাদের সবারই বাসনা হচ্ছে কলোনীসমূহের কর্তৃত্ব অন্যের হাতে কেন সোপর্দ থাকবে, অন্য জাতি কেন সব সময় তাদের মিত্রশক্তি হিসেবে থাকবে । মানবতার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে তাদের মধ্যে কেউ দাঁড়ায়নি । তাদের মধ্যে কেউ ঈসা মাসীহ এর মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য, দুনিয়াতে ইনসাফ কায়েম করতে, পাপ-পঙ্কিলতা, জুলুম-অত্যাচার ইত্যাদি মিটিয়ে দিতে শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করেনি । ইংরেজ, জার্মান, রুশ, আমেরিকা কেউই এর ব্যতিক্রম নয় । ভাল-মন্দ, ইনসাফ-জুলুম, হক-বাতিল ইত্যাদির কোনো বালাই নেই তাদের কাছে । ভুলেও তাদের মধ্যে এই চিন্তা আসেনি যে, আমরা দুনিয়াকে একটি সঠিক জীবন বিধান উপহার দিব কিংবা মানবতার খেদমত করব । তাদের কল্পনায় ছিল আমরা সোনা-দানার খনি গড়ে তুলব, রাষ্ট্রীয় সম্পদের ভাণ্ডার থেকে ইচ্ছেমতো উপকৃত হব ।

মানবতার শত্রু

তারা সারা বিশ্বে একচেটিয়া (Monopoly) কর্তৃত্ব কায়েম করতে চাচ্ছিল । তারা সবাই একই জীবন বিধানের ওপর ঈমান এনেছিল । সমস্ত দুনিয়াকে পদদলিত করে, মানবতার কফিনের ওপর দাঁড়িয়ে আনন্দ-উলাস প্রকাশ করতে এবং শক্তির মদমত্তে উন্মাদনার মনোবাঞ্ছাই তাদেরকে এদিকে তাড়িত করেছিল । স্বার্থান্ধ, ক্ষমতালিপ্সু, প্রবৃত্তির দাস, মদখোর, জুয়াখোর, স্রষ্টাবিস্মৃত, সহীহ ফিতরাতের প্রতি বিদ্রোহকারীরাই এ দলে যোগ দিয়েছিল । তাদের অন্তর ছিল নির্দয়, নিষ্ঠুর; মানবতার ব্যথায় তাদের অন্তর ব্যথিত হতো না । তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আজকের দেশ ও জাতিসমূহ ব্যক্তিগত ও জাতীয়

বিষয়াবলি, রাজনৈতিক দল ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জাতিপূজারী শাসকবর্গ পরিচালিত হচ্ছে । সবার কামনা-বাসনা একটাই–আমরা, আমাদের বন্ধু-সাথী এবং প্রিয়জনেরা যেন প্রাচুর্যের মধ্যে থাকতে পারি । তারা বর্তমান অবস্থাকেই সাদরে গ্রহণ করে নেয় । দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতেও তাদের কোনো পরোয়া নেই । যাদের হাতে কর্তৃত্বের লাগাম তারা দুনিয়ার পরিবর্তন চায় না, শুধু তাদের নেতৃত্বের ধান্ধায় লিপ্ত থাকে। তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা একটাই–অন্যের স্থান কিভাবে দখল করে নেয়া যায় । আপনাদের এখানে স্থানীয় নির্বাচন হয়, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ইত্যাদি নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন নতুন লোক আসে । কিন্তু নতুন কোনো দর্শন, জীবনব্যবস্থা কিংবা সেবার মহান ব্রত নিয়ে কি কেউ এগিয়ে আসে? সমাজের অনাচার ও পাপাচার নির্মূলের জন্য কি নতুন কোনো বোর্ড বা কমিটি গঠিত হয়–যাদের লক্ষ্য থাকে শুধু সেবা । আমরা তো জানি তারা সবাই একই চিন্তাধারা, একই জীবনপ্রণালী এবং একই জযবা নিয়ে এগিয়ে আসে । এ কারণেই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কোনো পরিবর্তন সাধন হয় না । জীবনের অনিষ্টতা ও সামাজিক পাপাচার চলতেই থাকে ।

জীবনের নকশাতেই ভুল

এর বিপরীতে নবী করীম সা. বলেন, জীবনের এই নকশাতেই ভুল রয়েছে । এই নকশা ভেঙ্গেচুড়ে আমূল পরিবর্তন করতে হবে । এর দৃষ্টান্ত এমন যে, কেউ একটি শেরওয়ানী সেলাই করল যা তার গায়ে পিট হচ্ছে না । সে এটাকে এদিক-ওদিক থেকে একটু কেটে কমিয়ে দেয় । তেমনি নবী করীম সা. বলেন, তাদের জীবনের এই পোশাকের মাপ ভুল । এই পোশাক গায়ে জড়িয়ে থাকলে ঝুলে থাকার কারণে চলতে সমস্যার সৃষ্টি করবে । এজন্য তা কেটে-কুটে পরিমাণ মতো করতে হবে ।

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন

সমস্ত বিশ্বের মানবতা আজ কুপ্রবৃত্তির নির্মম শিকার । দুষ্ট প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার পরিবর্তে দুনিয়ার সমস্ত দল-উপদল আজ এর তোষামোদীতে লিপ্ত । কুপ্রবৃত্তি ও দুশ্চরিত্রের দুর্বৃত্তপনা পরস্পরে হাত ধরে চলছে । একটি অন্যটিকে আশ্বস্থ করছে যে, যদি আমার হাতে কর্তৃত্ব আসে তবে আমি তোমার চাহিদা পূরণ করতে দিব, আরাম-আয়েশের পূর্ণ সুযোগ করে দিব । যদি নিজের প্রবৃত্তি পূরণ করতে চাও তবে আমাকে ভোট দাও, আমাকে সমর্থন কর । বর্তমানে প্রত্যেকেই বলে বেড়াচ্ছে আমরা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব পেলে তোমাদের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি এনে দিব, তোমাদের জীবনের ভিত সবল করে

দিব। চকলেটের প্রলোভন দেখিয়ে বাচ্চাদেরকে প্রবোধ দেয়ার মতো দুর্বৃত্তচক্র মানুষের চরিত্র হনন করছে। মানবতা আজ চকলেটের পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, তারা আজ শিশু বাচ্চা। দল ও নেতৃত্ব তাদেরকে প্রবৃত্তির মোহে আবদ্ধ করে চরিত্র ও মূল্যবোধ কেড়ে নিচ্ছে। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে তাদেরকে যতই দেয়া হয় তারা ততই চাইতে থাকে। ফিল্ম সামনে আসলে তাদের বাসনা আরো বেড়ে যায়। সে আরো উত্তেজনা কামনা করে। আরো নগ্ন দৃশ্য আকাঙ্ক্ষা করে। এটি দুনিয়ার প্রবৃত্তির ওপর লাগাম আরোপ করে না বরং এর চাহিদা অনুযায়ী যোগান দিয়ে যায়।

পয়গাম্বরদের পদ্ধতি

পয়গাম্বরদের পথ এটি নয়। তারা প্রবৃত্তিতে ভারসাম্যতা ও পরিমিতি আরোপ করেন। তারা বলেন যে, প্রত্যেকের প্রবৃত্তি পূরণ করার প্রচেষ্টা অপ্রাকৃত। নবী-রাসূলেরা বলেন, মানুষের হাভাতে হওয়া বিপদজনক। প্রবৃত্তিকে উপহাস করা উচিত, বাচ্চার মন খারাপ হোক, সে কিছু সময় কান্না করুক, চিৎকার করুক, এটা সহ্য করে নিতে হবে এবং তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে হবে। এটি একটি ভুল দর্শন যে, প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত না করা, এটাকে প্রশ্রয় দিতে থাকা এবং যখন এর ফাসাদ প্রকাশ পেয়ে যায় তখন হতাশার সঙ্গে তা প্রত্যক্ষ করে অভিযোগ করতে থাকা।

লাগামহীনতা

রাজনৈতিক দলসমূহের প্রচলিত পদ্ধতি ভুল, এ ধরনের জীবনধারা গ্রহণ করাও ভুল। লম্বা জিহ্বাবিশিষ্ট লাগামহীন, উদভ্রান্ত ঘোড়া মানবতার শষ্যক্ষেত দলিত-মথিত করে চলেছে। বর্তমানে সকল দলই এর সহিস (ঘোড়ার চালক) হতে চায়। লম্বা জিহ্বাওয়ালা লাগামহীন ঘোড়া দৌড়াচ্ছে, তাদের সামনে না মানবতার কোনো মূল্যায়ন আছে, না মানবিক সহমর্মিতা ও সমবেদনার অবলম্বন করার কোনো স্পৃহা আছে। ইউরোপ-আমেরিকা সমবেদনা ও সমধিকারের শ্লোগান দেয় কিন্তু তাদের সহমর্মিতাবোধের পরিমাপ আমাদের সকলেরই জানা। বেচারা বাইরে সহমর্মিতা প্রদর্শনের কসরত করে আর ভেতরে কামনা-বাসনার সেই ভূত জিইয়ে রাখে। সেখানে অবলম্বন করা হয় জুলুমের অভিনব সব কৌশল।

পদের যোগ্য কে?

আমরা বলি, জীবনের পথ গন্তব্য থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর বিশ্বাস (Belife) সৃষ্টি হবে না ততক্ষণ পথও সোজা হবে না। এটা ছাড়া আমরা জালেমকে সমব্যথী ও সহমর্মী বানাতে পারব না। আমি

আমার অধ্যয়নের আলোকে বলব, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি বিশ্বাস সৃষ্টি না করবেন, ততক্ষণ মানবতার প্রকৃত মডেল পর্যন্ত পৌছতে পারবেন না। এর থেকে সম্মান ও নেতৃত্বের মহব্বত, সম্পদের মহব্বত বের করে দিন; ত্যাগ, কুরবানী ও অন্যের জন্য গলে যাওয়ার স্পৃহা সৃষ্টি করুন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. বলেছিলেন, 'পদ সে-ই পাবে যে এর প্রতি লালায়িত নয়।' এটা পদের যোগ্যতা, আর বর্তমানে এর বিপরীতে নির্লজ্জভাবে নিজেই নিজের প্রশংসাগীতি গেয়ে রাজত্ব বানিয়ে নেয়া হয়।

সাহাবায়ে কেরামের ভূমিকা

সাহাবায়ে কেরাম এ থেকে পালিয়ে বেড়াতেন। হযরত ওমর ফারুক রা. মাফ চেয়েছিলেন যে, এই জিম্মাদারীর বোঝা থেকে আমাকে মুক্তি দেয়া হোক। তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল এই বলে যে, আপনি যদি সরে দাঁড়ান তবে কে ব্যবস্থাপনা আঞ্জাম দিবে? তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত তা করতেন ততক্ষণ এটাকে বিশাল জিম্মাদারী এবং বোঝা মনে করতেন। যখন দায়িত্বমুক্ত হতেন তখন অত্যন্ত স্বস্থি (Relief) অনুভব করতেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রা.-কে প্রধান সেনাপতি (Commonder in chief) বানানো হয়েছিল। চারদিকে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে চূড়ান্ত মুহূর্তে মদীনা থেকে সামান্য একটি চিরকুট আসল যাতে লেখা আছে, 'খালেদকে অপসারণ করা হয়েছে, তাঁর স্থলে আবু উবায়দাকে প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত করা হয়েছে।' তিনি বিন্দুমাত্রও বিমর্ষ হলেন না, অত্যন্ত ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে বললেন, আমি যদি এ কাজ ইবাদত হিসেবে করে থাকি তবে আজও আঞ্জাম দিব। আর যদি ওমর রা. এর জন্য করে থাকি তবে এখান থেকে সরে যাব। অতঃপর লোকেরা দেখতে পেল, তিনি সেই উৎসাহ উদ্দীপনায় তাঁর কাজে মশগুল হয়ে গেলেন। তাঁর কাজে বা আচরণে কোন পরিবর্তন আসল না।

সম্মানের বাসনা এবং সম্পদের ভূত

বর্তমানে রাজনৈতিক দল থেকে যদি কাউকে বের করে দেয়া হয় তবে প্রথমে বেরিয়ে যাওয়ার নাম-গন্ধও নেয় না, দলে থেকেই ফেতনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। যদি বেরিয়ে যায়ও অন্য আরেকটি রাজনৈতিক দল গঠন করে নেয়। এটা কেন! এজন্য যে, সম্মান-প্রতিপত্তির বাসনা, সম্পদের মোহ এবং বড়ত্বের অভিলাস মন-মগজে ঝেঁকে বসেছে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান জীবনের ধাঁচ পরিবর্তন হবে না ততক্ষণ প্রতিকার অসম্ভব। আমি আপনাদেরকে স্বচ্ছ জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করছি। আল্লাহর ভয় এবং তাঁর সন্তুষ্টির

স্পৃহা সৃষ্টি করুন। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন গঠন করুন। প্রমোদস্পৃহা যে জীবনের আদর্শ হয়ে গেছে, জীবন থেকে তা বর্জন করুন।

প্রয়োজন ও প্রবৃত্তি

মানুষের প্রয়োজনের ফিরিস্তি খুব একটা দীর্ঘ নয়, তবে বাহুল্যের তালিকা অনেক লম্বা। প্রত্যেকেই জীবনের ভিত্তি এর ওপর রেখেছে যে, উপভোগকে জীবনের পরম লক্ষ্য বানিয়ে নাও। পেট ও কুপ্রবৃত্তিকে মাবুদ বানিয়ে নাও। আল্লাহকে মেনো না, তাঁর কর্তৃত্বের অস্বীকার কর। মানুষকে উৎকর্ষমণ্ডিত প্রাণী মনে কর এবং এর সর্বাত্মক প্রবৃত্তি পূরণ কর। এসবই হচ্ছে এর ফাসাদ। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভিত্তি অক্ষুন্ন থাকবে হাজার চেষ্টা-তদবির সত্ত্বেও সঠিক পথের সন্ধান অসম্ভব। কোনো শহর-রাষ্ট্রের তো দূরের কথা ছোট্ট নগরীরও সংশোধন হবে না।

ভুল একক দ্বারা উত্তম সমষ্টি কিভাবে সম্ভব?

আজ মানবতার একক এবং সোসাইটির খণ্ডসমূহ অতিশয় বিধ্বস্ত ও অসম্পূর্ণ। কারণ ভুল ভিত্তির ওপর এর সূচনা হয়েছে। ভুল পদ্ধতিতে এর প্রতিপালন হয়েছে। ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, বর্তমানে সমস্ত মানবগোষ্ঠী বিধ্বস্ত, অসম্পূর্ণ এবং দুর্বল। সমষ্টি গঠিত হয় একক দ্বারা। যতক্ষণ পর্যন্ত একক পরিশুদ্ধ ও সৎ হবে না, ততক্ষণ সমষ্টির কাজ কিভাবে সঠিক হবে? ব্যক্তির প্রশ্ন উঠালে লোকেরা বিরক্ত হয়, অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চায়। তারা এই ধারণা পোষণ করে যে, সামষ্টিক এই অপূর্ণতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে দূর হয়ে যাবে। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, যখন ইটভাটা থেকে ইট অপূর্ণ অবস্থায় বের করা হয় তখন লোকেরা বলাবলি করে, এই ইট পীত বর্ণের, অপরিপক্ক, এই ইট ভাল নয়, এটি ইমারতের বোঝা বহন করতে পারবে না। আপনি জবাব দিলেন, প্রাসাদ গড়ে উঠতে দিন, ওই সব ইট ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু মন্দ ও অসম্পূর্ণ একক দ্বারা কিভাবে উত্তম সমষ্টি গঠন হবে? খারাপ কাঠ দ্বারা একটি ভাল নৌকা কিভাবে তৈরি হতে পারে? আমাদের কথা হলো, ইউনিট খারাপ, মাল-মসলা (Material) খারাপ, এর দ্বারা উত্তম অবয়ব কিভাবে গঠন হতে পারে? এর দ্বারা আদর্শ নগর ও মহকুমা কিভাবে গঠিত হবে? আজকে সারা বিশ্বে এটাই হচ্ছে। এটা কি নির্বুদ্ধিতার কথা নয়? পয়গাম্বরগণ কাঠ বানান, ইউনিট গঠন করেন, ইট তৈরি করেন, তাই তাদের নির্মাণ হয় আস্থার, সৎ এবং প্রাণোচ্ছল। সেখানে কোনো প্রকার ধোঁকাবাজি হয় না।

বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পর্যন্ত বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইয়াকীন ও আখলাক সৃষ্টি করার সাধনা কোথাও করা হচ্ছে না। ব্যক্তি গঠনের ব্যবস্থা

কোথাও নেই। সবখান থেকেই অপ্রশিক্ষিত ব্যক্তির বহর বের হচ্ছে। বর্তমানের তালেবে ইলম সব ধরনের কাজ করতে পারে। তা এই জন্য যে, এর কোনো বিধান করা হয়নি মিউনিসিপালে কে থাকবে, মহকুমায় কোন লোক কাজ করবে। সমস্ত সমাজব্যবস্থায় যারা পেরেশান তাদের হাতেই জীবনের লাগাম। আজ অধিকাংশ মানুষ মানুষ নয়, মানবতার গণ্ডি বহির্ভূত।

খোদাভীতির গুরুত্ব

বাস্তবতা প্রকাশ হয়েই থাকে, এতে যতই লোভ-লালসা চড়ে বসুক। গাধা সিংহের চামড়া পরেছিল কিন্তু যখন বিপদ দেখা দিল তখন ভয়ে নিজের ভাষায় চেঁচামেচি শুরু করল। আজ সর্বত্র এটাই হচ্ছে, আভ্যন্তরীণ জিনিস বাইরে বেরিয়ে আসছে। আপনাদের অনেকেই চেষ্টা করছেন, আপনাদের মধ্যে অনেক মুখলিস লোকও আছেন, কিন্তু আপনি কি কখনো গোড়া থেকে পরিশুদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেছেন। লোকেরা দলীয় নেতৃবৃন্দের পেছনে লেগে আছেন কিন্তু তাদের করণীয় তো ছিল এমন কাজ করা যাতে মানুষের মর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়, খোদাভীতি জন্ম নেয়।

আল্লাহর বসতি দোকান নয়

আল্লাহর বসতিকে বস্তি মনে করা হয়েছে, প্রত্যেকে পরস্পরে খরিদ্দার মনে করে আচরণ করছে। এই ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি ধ্বংসাত্মক। আজ সর্বত্র শুধু চাওয়া আর চাওয়া। কোথাও ছাত্র-শিক্ষকের টানাপোড়েন, কোথাও মালিক-শ্রমিকের সংঘাত, এসব কেন? এসবই ওই ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির ফল। পয়গাম্বরদের কথা হচ্ছে, প্রত্যেকেই পরস্পরের ওপর হক রাখে, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। দায়িত্ব পালনে যত্নবান হও এবং হক আদায় করার ক্ষেত্রে দরাজ দিল হও। আমরা এটাই বলি যে, আপনারাও তা-ই করুন, পরিস্থিতি পাল্টে যাবে, জীবনে সমৃদ্ধি আসবে। আজ লুটতরাজের বাজার চড়া, প্রত্যেকের দৃষ্টি ব্যস্ততার দিকে, মানুষের অক্ষমতার প্রতি নয়।

আমাদের অস্তিত্ব যেকোনো পার্টি থেকে জরুরী

আমরা নিজেদের পয়গামকে প্রত্যেক পার্টির জন্য জরুরী মনে করি। আমাদের অস্তিত্ব যেকোনো পার্টি থেকে অতি প্রয়োজনীয়। কেননা আমাদের কার্যসিদ্ধি হলেই কেবল মানবতার বাগান সজিব হয়ে উঠবে। বর্তমানে কাঁটা জন্ম নিচ্ছে, প্রকৃত মানুষ আজ দুর্লভ বস্তু হয়ে পড়েছে। আমরা বলতে এসেছি, মানবতার বসন্ত ফিরিয়ে আন, মানবতাকে সুসজ্জিত কর। বর্তমানে মানবতার বাগানে কাঁটাযুক্ত, বিস্বাদ ফল জন্ম নিচ্ছে। আপনি মানবতার বাগানে মিষ্ট ফল ফলান। আমরা আপনার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে আসিনি। আমরা বলতে

এসেছি, মানবতার খবর নিন। আমরা এই বিকৃত দুনিয়ার বিরুদ্ধে বাদানুবাদ করতে এসেছি। যদি এই বোধ জাগ্রত হতো যে, এটা পয়গাম্বরদের কাজ! যেমনটা স্মরণ করতে আমরা এখানে এসেছি। হয়ত কোনো মস্তিষ্কে কথাগুলো রক্ষিত থাকবে, কোনো পেট পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, কোনো কাপড় অথবা জায়গায় আটকে থেকে যাবে। আর এটাই আল্লাহর ধর্মের বিশ্বাস ও মহব্বতের সঙ্গে অন্তরে স্থান করে নিবে, এটি দূর করবে চোখের খোচা ও জ্বালা। তাঁদের মেহনত দ্বারাই দিলের উত্তাপ বের হয় এবং দিলের প্রশান্তি লাভ হয়।

তোমাদের পদমর্যাদা এজেন্ট বা চাকুরে নয় বরং দাঈ ও রাহবার

আমরা মুসলমানদের প্রতি নিবেদন করে বলি, তোমরা পয়গাম্বরদের কাজ এবং তাদের পয়গামের বড়ই অবমূল্যায়ন করেছ, তোমরা অপরাধী। তোমরাও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি অবলম্বন করেছ এবং বেপারী হয়ে গেছ। তোমাদের পদমর্যাদা তো বেপারী কিংবা চাকুরে ছিল না। তোমরা এখানে এসেছিলে দাঈ হিসেবে। তোমরা দাঈ'র বৈশিষ্ট্য এবং নিজের আগমনের উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছ। তোমরা যদি দাওয়াত ও মহব্বতের পয়গামের সঙ্গে বাস করতে তবে ইজ্জতের সঙ্গে জীবিত থাকতে, সাফল্য ও সমৃদ্ধির জীবন লাভ করতে। এখন তোমাদের সাফল্য এটাতেই যে, ওই পয়গাম্বরদের বার্তার মূল্যায়ন করবে। রাজনৈতিক পার্টি এবং বিভিন্ন দল, নেতৃত্বের লড়াই এবং বিজয় ও কর্তৃত্বের সংঘাত ছেড়ে দিয়ে জীবনের ওই বিকৃত চিত্র পুনঃনির্মাণের চেষ্টা করা। নিজে, নিজের সংশিষ্টজন এবং প্রিয়জনদের পরিবর্তে সমগ্র মানবতার কথা চিন্তা করা যে, তাদের পরিশুদ্ধি ব্যতীত কারো স্বস্থি ও নিরাপত্তা অর্জিত হবে না।

রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বাধীনতা

আমি এবং আপনারা যে স্থানে (আমিনদৌলা পার্ক, লক্ষ্মৌ) একত্রিত হয়েছি সে পার্কটি হিন্দুস্তানের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। যুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাসবিদেরা এটাকে ভুলতে পারবে না। খেলাফত আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন এ পার্ক রাজনৈতিক সভা-সমিতির প্রাণকেন্দ্র ছিল। আমি নিজ চোখে এখানে বড় বড় ঐতিহাসিক দৃশ্য দেখেছি। আমি এখানে গান্ধিজীসহ শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের ভাষণ শুনেছি। আবার ইংরেজ সৈন্যদের বর্বর আচরণেরও সাক্ষী এ পার্কটি। যে সময়ে আমি হিন্দুস্তানে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতাম তখন বড় বড় জ্ঞানী-গুণী লোকদেরও এ কথা বিশ্বাস হতো না এ স্বপ্ন কখনো বাস্তব রূপ লাভ করবে। যারা বিশ ত্রিশ বছর পূর্বে নিশ্চিত করে বলত আযাদী অবশ্যই আসবে তাদের কথাতেও শিক্ষিত শ্রেণী আস্থা আনতে পারতো না। ৪৭ সালের আযাদীর পূর্বে এ ধরনের লোক এদেশে ছিল যারা একথায় হাসি-বিদ্রূপ করে বলত, এদেশ বৃটেনের যক্ষের ধন, এর দ্বারাই তারা দুনিয়াতে টিকে আছে; তারা কিভাবে এদেশ থেকে তাদের হাত গুটিয়ে নিবে? কিন্তু এসব তাদের কথা হিসেবেই রয়ে গেছে। বাস্তবতা হচ্ছে, দুনিয়াতে অসম্ভব বলতে কোন জিনিস নেই–শুধু মানুষের সিদ্ধান্ত ও দৃঢ়তা শর্ত।

যেমনিভাবে আপনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, দেশকে ইংরেজদের গোলামী থেকে মুক্ত করতেই হবে। নেতৃত্বের অধীনে চেষ্টা-তদবিরের ফলে যেমনিভাবে স্বপ্ন পূরণ হয়েছে, এমনিভাবে যদি এর থেকে সামনে বেড়ে কোনো একটি সংঘবদ্ধ জামাত গঠন করে এর জন্য সাধনা করতেন তবে সেটাও পূরণ হতো। কিন্তু ওই সময় স্বাধীনতাটাকেই সর্বোচ্চ ও মূখ্য মনে হতো। নিঃসন্দেহে আযাদী একটি বিশাল নিয়ামত এবং জীবনের অনিবার্য প্রয়োজন। এর জন্য যে ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করা হবে সেটাও ব্যাপক সমাদৃত। আমাদেরকে ওই সব পথপ্রদর্শকেরও

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশ স্বাধীন করেছেন। কিন্তু আমি পরিষ্কারভাবে এ কথা আরজ করতে চাই, যে সিদ্ধান্ত ও শক্তির বদৌলতে আমরা গোলামীর অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছি সেই সিদ্ধান্ত ও শক্তিকে যদি এর চেয়েও বাস্তবিক ও পূর্ণাঙ্গ আযাদী অর্থাৎ মানবিকতা গঠন ও উন্নয়ন এবং মানুষকে মানুষ বানানোর কাজে ব্যয় করি তবে এটা হবে দুনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সমস্যা ও সংকটের চিরস্থায়ী সমাধান।

স্বাধীনতার পূর্বে

আমি আযাদী আন্দোলনের প্রতি অবজ্ঞা বা না শোকরী করছি না, তবে এটা না বলেও পারছি না যে, দুনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং মানবতার সবচেয়ে বড় খেদমত হচ্ছে, মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে যাওয়া। এছাড়া স্বাধীনতা ও স্বাধীকারের পরও জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য, প্রশান্তি এবং স্বচ্ছন্দ হাসিল হয় না। বিক্ষিপ্ততা, টানাপোড়েন এবং অস্বস্থি দূর হয় না। বিপদাপদ, ব্যতিব্যস্ততা ও অপমান শুধু অন্যের আকৃতিতেই আসে না, কখনো নিজের থেকেই এর স্ফুরণ ঘটে। জুলুম-নির্যাতন ও লুট-তরাজের জন্য ভিনদেশী হওয়া শর্ত নয়। একই দেশে অবস্থানকারী দ্বারা কখনও এ কাজ সংঘটিত হতে পারে। গোলামীর প্রতি ঘৃণা আমারও কম নয়। কিন্তু আবেগ ও মোহ থেকে আলাদা হয়ে একটু চিন্তা করুন! আমরা ইংরেজদের কেন আমাদের শত্রু মনে করতাম? গোলামীর প্রতি আমাদের ঘৃণা কেন ছিল? এজন্য যে, জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য আমাদের সহায়ক ছিল না। আমাদের কোনো স্বস্থি ছিল না। আমাদের জীবনের প্রয়োজন পূরণ সহজসাধ্য ছিল না। আমরা সহমর্মিতা, একনিষ্ঠতা, সহযোগিতাবোধ এবং প্রেম-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত ছিলাম–যাতে অতীত জীবন হয় তিক্ত এবং এ দুনিয়ার জেলখানাসদৃশ। মনে করুন! যদি বাইরের গোলামীর অবসান ঘটে কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যেই একে অপরকে গোলাম বানানোর প্রবণতা চালু হয়ে গেল। আমাদের পরস্পরে জুলুমে স্বাদ অনুভূত হতে লাগল। আমরাও একে অন্যের অপরিচিত, অজ্ঞাত। সহযোগিতা ও সহমর্মিতা থেকে অনেক দূরে। এক শহরের লোক অন্য শহরের লোকের সঙ্গে এমন আচরণ করতেই উদ্বুদ্ধ হচ্ছি, শুধু সুযোগের প্রত্যাশায় আছি–যা বিজয়ী গোলামের সঙ্গে এবং শত্রুর সঙ্গে করে। আমরা আমাদের সঞ্চিত সম্পদে অন্যের অপরিহার্য প্রয়োজনীয় সম্পদটুকু ঢুকিয়ে দেয়ার পাঁয়তারায় লিপ্ত। এ ধরনের মানসিকতা দেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। কুরআনে কারীম এটাকে একটি ঘটনার দ্বারা বিবৃত করেছে।

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, হযরত দাউদ আ. এর কাছে দু'পক্ষ মুকাদ্দামা নিয়ে আসল। একজনে বলল, হে আল্লাহর নবী! হে বাদশা! আপনি অনুগ্রহ করে

আমাদের প্রতি একটু ইনসাফ করুন। আমার এ ভাইয়ের কাছে ৯৯টি ভেড়া আছে, আমার আছে মাত্র একটি ভেড়া। কিন্তু এই জালেম বলছে, আমি যেন তাকে আমার ভেড়াটিও দিয়ে দিই, তবে তার শত পুরো হবে। আমি আপনার কাছে জানতে চাই, যদি কোনো রাষ্ট্রে বা শহরে এ ধরনের মনোভাবের প্রসার ঘটে তবে কি স্বাধীনতার প্রকৃত সম্পদ সেখানে বাস্তবে রক্ষিত আছে? বিষয়টি কি এমন নয় যে, উপনিবেশ গোষ্ঠী যে আচরণ করত সেটাই স্বজাতি, প্রতিবেশির দ্বারা করা হচ্ছে। পরাধীনতার সব শৃঙ্খলই কি এখানে কোনো না কোনোভাবে বিদ্যমান নয়? এসব কিছু এজন্য যে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য প্রাণপণে লড়াই করে দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। কিন্তু মানুষের মন-মগজ এবং তার আত্মার প্রশান্তির জন্য কোনো চেষ্টা করা হয়নি। ফলে সেগুলো যথারীতি গোলামই রয়ে গেছে। দেশ থেকে জালেম বিতাড়িত করা হয়েছে কিন্তু দিল থেকে জুলুমের বাসনা নির্মূল করা হয়নি। সেটি বহাল আছে এবং নিজের কাজ করে যাচ্ছে।

আত্মার আলো

নবী-রাসূলেরা আল্লাহপ্রদত্ত সমস্ত শক্তি এবং নিজেদের পুরো মনোযোগ ব্যয় করেছেন প্রকৃত অর্থে পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরির কাজে। তারা শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে নিজেদের দৃষ্টিভূত করেননি। বরং অনুভূতির জ্বলন তৈরি, ঈমান-আকীদাকে মন-মগজে সুদৃঢ়করণ এবং ওই আখলাক সৃষ্টির প্রতি গভীর মনোযোগ দিয়েছেন যাতে উপনিবেশ ও আভ্যন্তরীণ কোনো দাসত্বেরই সুযোগ ছিল না। যার কারণে মানুষ অন্যের গোলামীও বরদাশত করতো না এবং অন্যের ওপর নিজের গোলাম আরোপ করার মনোবাসনাও পোষণ করতো না। যার ফলে অন্যের শিকারেও পরিণত হতো না আবার অন্যকেও নিজেদের শিকারে পরিণত করতো না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. এর দৃষ্টান্ত দেখুন! তাঁর পাশে আত্মত্যাগী, উৎসর্গকারী যে বিশাল জামাত জড়ো হয়েছিলেন তাদের দ্বারা তিনি যেকোনো কাজ আঞ্জাম দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাদের চারিত্রিক উৎকর্ষ ও মানবিকতা উন্নয়নে তাঁর সমস্ত সামর্থ্য ব্যয় করেছেন। তিনি মানবতাকে এমন কোনো চোখ ধাঁধানো আবিষ্কার কিংবা তথ্য-প্রযুক্তি দেননি ইউরোপের বিজ্ঞানীরা যা এ যুগে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী [রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাঈন] এর মতো কিছু মানুষ তৈরি করে গেছেন যারা মানবতার জন্য রহমত ও বরকতের ভাণ্ডার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছেন। আজও যদি মানবতাকে প্রশ্ন করা হয়–তারা শাসনকর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের জন্য আবু বকর রা. এর মতো মানুষ চায় নাকি সর্বাধুনিক আবিষ্কারসমূহ হাতের

নাগালে চায়। নিশ্চয় তাদের কাছ থেকে উত্তর আসবে–আবু বকর রা. এর মতো মানুষই তাদের বেশি প্রয়োজন। কেননা তারা আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি এবং আবিষ্কারসমূহ ভালভাবেই পর্যবেক্ষণ করে দেখছে, প্রকৃত মানুষের অবর্তমানে এসব দুনিয়ার জন্য মসিবত ও ধ্বংসের বার্তাবাহক।

মুক্তির মহাতন্ত্র

আমি বারবার বলেছি এবং বলব, সবচেয়ে অগ্রগণ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষ বানাতে হবে। তখন তার মধ্যে গোনাহ ও জুলুমের বাসনা নির্মূল হবে, নেক ও খেদমতের জযবা সৃষ্টি হবে। মানুষের জীবনধারায় হাজারো প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয়, মানবিক জীবনে অসংখ্য সমস্যা ও সংকট দেখা দেয়, ভারী ভারী তালা পড়ে, আর এসব সংকট ও তালা খোলার একটি মাত্র চাবি, এটাকে মুক্তির মহাতন্ত্র, মূল চাবিকাঠি (Master key) হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। এ চাবিকাঠি আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলদের কাছে ছিল। একমাত্র তাদের সঙ্গে সম্পর্ক কায়েমের মাধ্যমেই এটা অর্জিত হয়। এই চাবিকাঠি হচ্ছে, আল্লাহর মহান সত্তার প্রতি নিটোল বিশ্বাস এবং তাঁর ভয়। এই চাবিকাঠি দ্বারাই মানবিক জীবনের সমস্ত সমস্যা ও সংকট অতি সহজে দূরীভূত হয় এবং জীবনের সব আবিলতা মুক্ত হয়। মনে করুন, পয়গাম্বরদের হাত বৈদ্যুতিক সুইচের উপর। তারা উক্ত সুইচে টিপ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরো ঘর আলোকিত হয়ে গেল। যাদের আঙ্গুল ওই সুইচ পর্যন্ত পৌঁছবে না তারা ঘর আলোকিত করতে পারবে না।

ব্যক্তিগঠন ও চারিত্রিক সংশোধন ছাড়া কোনো প্রজেক্ট সফল হয় না

বর্তমানে প্রতিটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন-অগ্রগতি ও আধুনিক ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হয়। আমাদের দেশেও এ কাজ দ্রুতগতিতে হচ্ছে। আল্লাহ এসব প্রজেক্টকে সফল করুন। কিন্তু এই প্রজেক্ট আমাদের দৃষ্টিতে এখনও অপূর্ণাঙ্গ ও অপরিপক্ক। এখানে মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন এবং চারিত্রিক সংশোধনের কোনো ব্যবস্থা নেই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে লোভ-লালসার শিখা অনির্বাণ থাকবে, সম্পদ জমানোর ভূত সক্রিয় থাকবে, মানুষ শুধু সম্পদ উপার্জন ও ভোগ-বিলাসেই নিজেদের জীবনের পরম লক্ষ্য মনে করবে–ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো নকশা এবং কোনো প্রজেক্টই সাফল্যের মুখ দেখবে না। যেসব দেশে এ ধরনের প্লান-প্রোগ্রাম সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়ন হয়েছে, উন্নতির বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে এসেছে–তাদের কি প্রকৃত স্বস্তি ও নিরাপত্তা হাসিল হয়েছে? সেখানে কি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় না? অপরাধের দিক থেকে তো ওই সব

দেশ আমাদের থেকে অনেক ডিগ্রী এগিয়ে। সেখানে দিনে-দুপুরে ডাকাতি-লুটপাট হয়। বড় বড় সম্পদশালী, শিল্পপতিদের দিবালোকে ছিনতাই করে নেয়া হয়। তাদেরকে আটক করে আত্মীয়দের কাছ থেকে মোটা অংকের মুক্তিপণ আদায় করা হয়। বর্তমানে ওই সব তথাকথিত সুসভ্য দেশের চারিত্রিক পদস্খলন এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা তাদের নিজেদের অস্থিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান। জাতিপূজা এবং দেশপ্রীতি তাদের অস্তিত্বকে কোনো রকম টিকিয়ে রাখছে। তবুও তাদের বিলুপ্তি খুব বেশি দূরে নয়। আল্লামা ইকবালের ভাষায় বললে অত্যুক্তি হবে না 'গাছের পাকা ফলের মতো নিজে নিজেই ঝরে পড়ছে, দেখুন! অবশেষে ফিরিঙ্গিরা কার ঝুলিতে খসে পড়ে।'

ব্যক্তি গঠনের প্রয়োজনীয়তা

ধন-সম্পদের এই হয়রানি, স্বৈরাচারী এই চিন্তাধারা এবং জুলুম-নির্যাতনের প্রবৃত্তি কোনো ধর্মের প্রবর্তন অথবা কোনো গোষ্ঠীর সহায়ক হতে পারে না। চোর এবং অপরাধীর ধর্ম হিন্দুও না, মুসলমানও না। যার মধ্যে এই প্রকৃতি ও আচরণ চলে আসে তার কাছে এটার কোনো পরোয়া নেই–সে কার গলা কাটছে, সে কোন ধর্ম বিশ্বাসের অনুসারী। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনও তার কাছে মূল্যহীন। এরচেয়ে বড় কোনো দুর্যোগ নেই, এর চেয়ে ভয়াবহ কোনো বিপদ নেই–আল্লাহর আওয়াজকে বুলন্দ করার মতো কোন লোক এদেশে নেই। নৈতিক সংশোধন এবং প্রকৃত মানুষ গড়ার কোনো দাওয়াত ও আন্দোলন নেই। বর্তমানে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা তথা পুরো সমাজ-ব্যবস্থায় হয়তো ব্যবসায়িক আধিপত্য অথবা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। এদেশের বড় বড় সংবাদপত্র পড়ে দেখুন–এ দুটি বিষয় ছাড়া এমন কোনো বিষয় পাওয়া যাবে না যার সম্পর্ক আত্মার সঙ্গে কিংবা চরিত্র ও মানবিকতার সঙ্গে। এ ক্ষেত্রে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও মতবাদের একই দৃষ্টিভঙ্গি। এ ব্যাপারে কারো কোনো মতানৈক্য বা বিরোধ নেই। যাদের যাবতীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত হচ্ছে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দখল নিয়ে। যা কিছু হচ্ছে সবকিছুর কৃতিত্ব নিজেদের অনুকূলে নেয়ার জন্য।

নৈতিক অবক্ষয়

নৈতিক অবক্ষয় বাড়তে বাড়তে এই সীমা অতিক্রম করেছে যে, এখন মানুষের মনুষ্যত্ব নির্মূল হয়ে গেলে ফূর্তি করা হয়। বরং হাসি-বিদ্রূপ এত বেড়ে গেছে যে, মনুষ্যত্ববোধ যতই নিম্নগামী হয় পরিতৃপ্তি ও আনন্দের মাত্রা ততই বাড়তে থাকে। এই ফিল্ম-ফটো, নভেল-নাটক, পর্নোগ্রাফি এবং অশ্লীল গান-বাদ্য কেন আপনার বিনোদনের উপকরণ? এগুলোতে কি মানবিক মূল্যবোধকে পদদলন করা হয় না? এগুলো কি আদম-হাওয়ার সন্তানদের, যারা আপনাদের

ভাইবোন–এমনভাবে উপস্থাপন করে না যা মানবিক মূল্যবোধের জন্য অপমানজনক? আপনার কি এসব ছায়াছবি, খেলাধুলা, পর্নো ফিল্ম এবং নভেল-নাটকে মানবতার পদস্খলন ও চরম জিল্লতি নজরে ভাসে না? তবুও কেন আপনার রুচিতে কোনো ঘৃণাবোধ জাগছে না? আপনি এগুলোর সঙ্গে কিভাবে একাত্মতা পোষণ করেন?

যখন কোনো সমাজ নৈতিকভাবে অনুকরণীয় হয় তখন এর কোনো সদস্য অপর সদস্যের অপমান সহ্য করা তো দূরের কথা তার ব্যাপারে মন্দ কোনো কথা শোনাও পছন্দ কনে না। কুরআনে কারীমে একটি মিথ্যা অপবাদের কথা উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে 'তোমরা একথা শুনেই কেন এটা প্রত্যাখ্যান করনি, স্পষ্ট করে কেন বলে দাওনি–এটা নিছক অপবাদ। তোমরা নিজেদের ব্যাপারে সুধারণা কেন পোষণ করনি। নিজের উপরে আস্থার সঙ্গে কেন কাজ করনি।' এটা ওই সমাজের কথা যাকে আইডিয়েল সমাজব্যবস্থা বলার যোগ্য। যে সমাজে প্রত্যেকেই ছিলেন পরস্পরের আয়নাসদৃশ। এর তুলনা করুন অধঃপতিত এই সমাজব্যবস্থার সঙ্গে যার কতিপয় সদস্য অন্যান্য সদস্যের চারিত্রিক স্খলন এবং মানবিক মূল্যবোধ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে খুশি প্রকাশ করে। একজন মানুষ তার শরীর উলঙ্গ করছে, কুপ্রবৃত্তির শিকার হয়ে অসামাজিক কার্যকলাপ করছে, নিজের ইজ্জত-আব্রু বিকিয়ে দিচ্ছে আর হাজার হাজার মানুষ এর তামাশা দেখছে, তা দেখে আনন্দ-ফূর্তি করছে–চারিত্রিক স্খলন ও মূল্যবোধবিনাশী এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি হতে পারে? উদ্ভুত পরিস্থিতি ও ভয়াবহ চিত্র অশনি সংকেত দিয়ে যাচ্ছে যে, এদেশ বস্তুগত উৎকর্ষ ও বাহ্যিক চাকচিক্য সত্ত্বেও না জানি কখন পতনের অতল গহবরে হারিয়ে যায়। এসব অসৎ চরিত্র, পাপাচার ও অবৈধ ভোগ-বিলাসের প্রবণতা মরণব্যাধি থেকেও ভয়াবহ। আপনি অতীত কোনো জাতির নাম বলুন, যাদের ব্যাপারে ইতিহাসে এ কথা লেখা আছে যে, পুরো জাতি অমুক ব্যাধিতে অথবা অমুক বিপর্যয়ে পতিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি এমন বিশটি জাতির নাম বলতে পারব যারা দুশ্চরিত্রের শিকার হয়ে ইতিহাসের পাতা থেকে লীন হয়ে গেছে।

মানবিক মূল্যবোধ

এদেশ স্বাধীন করতে আপনারা সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা করেছেন, ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, নেতৃবৃন্দের দেখানো পথে গমন করেছেন–ফলে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আপনাদের অর্জিত হয়েছে। এখন মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নতুন করে আপনাদের চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের এটাই একমাত্র পথ। আর এটা ওই পথ যে পথের

নির্দেশ করেছেন আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলেরা, যে পথে গমন করে গন্তব্যে পৌছতে সক্ষম হয়েছেন অনুসারীরা। তারা দুনিয়াতে প্রকৃত মানুষের নমুনা প্রদর্শন করেছেন। এ পথের পাথেয় হচ্ছে ঈমান, একীন এবং খোদভীতি। প্রকৃত খোদাভীতি, তাজা ঈমান এবং জাগ্রত কলব নবী-রাসূলদের ছাড়া আর কোথাও মিলবে না। এটাই তাদের ভাণ্ডার, এ ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করতে আমাদের কোন লজ্জা-সংকোচ থাকা উচিত নয়। আজ যদি এসব গুণ অর্জন এবং প্রচার-প্রসারে আযাদী সংগ্রামের মতো ত্যাগ-তিতিক্ষার সূচনা হয়, উপনিবেশ বিতাড়নে যে সাধনা করা হয়েছে সে সাধনা যদি করা হয়–তবে দেশের চেহারাই ভিন্ন রূপ ধারণ করবে। অর্জিত হবে প্রকৃত অর্থে শান্তি ও নিরাপত্তা। বন্ধ হবে দাসত্বের চলমান ধারা। দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা এবং জীবনের প্রকৃত স্বাদ তখনই হাসিল হবে।

জীবন গঠনে ব্যক্তির গুরুত্ব

সবাই জানেন, আমাদের সমাজ ও বর্তমান জীবন পদ্ধতিতে কোনো না কোনো ত্রুটি অথবা অপূর্ণতা রয়েছে, যার ফলে জীবনের অবকাঠামো সঠিকভাবে বসছে না। একটি ত্রুটি দূর করলে আরও চারটি ত্রুটির জন্ম দিচ্ছে। আজকের পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রও এ ত্রুটির অনুযোগকারী। তারা অনুমান করতে শুরু করেছে, মূল ভিত্তিতে কোনো ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু তারা তাদের ভেতরগত জটিল সমস্যাগুলো থেকেই নিস্কৃতি পাচ্ছে না। আমরা তাদের এই সমস্যা ও তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করছি না। কিন্তু এসব সমস্যা ও বিষয়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিবেচনা। কারণ আমাদের প্রথম ও প্রধান পরিচিতি মানুষ হিসেবেই। আর এসব সমস্যা আসে পরবর্তী পর্যায়ে।

যাদের হাতে জীবনের বাগডোর, তারা জীবনের গাড়ি এতই দ্রুত চালাচ্ছে যে, এক মিনিটের জন্যও তা থামিয়ে ত্রুটি অনুসন্ধান করতে তারা প্রস্তুত নয়। তারা এটা দেখতে চাচ্ছে না যে, তারা সঠিক পথে চলছে নাকি ভুল পথে চলছে। আর এ ত্রুটির ফলে এই গাড়ির যাত্রী কিংবা আগামী প্রজন্মের জন্য ধরনের সমূহ বিপদ সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। বরং তাদের ভাবনা হলো সে গাড়ির চালক যেন তারাই হতে পারে। তারা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথকভাবে পৃথিবীকে শুধুমাত্র এই আশ্বাসবাণী উৎকোচ হিসেবে দিচ্ছে যে, গাড়ির হেন্ডেল যদি তাদের হাতে থাকে, তাহলে সে দ্রুত থেকে দ্রুতগতিতে গাড়িকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। আমেরিকা ও রাশিয়াসহ প্রত্যেকের দাবী এবং ওয়াদা হচ্ছে, যদি পৃথিবী নামক গাড়িটির চালক সে হতে পারে, তাহলে সে তা অন্যের চেয়েও দ্রুতগতিতে চালিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু তাদের কেউ এই চলার লক্ষ্য ও গন্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করছে না।

সংঘবদ্ধতার প্রাধান্য

এবার আমি বলছি ভুলটি কী এবং কোথায় হচ্ছে? বর্তমানে পৃথিবীতে বড় বড় সংগঠন গড়ে উঠছে। সাম্প্রতিক সময়ে সংঘবদ্ধতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। প্রতিটি কাজই করা হচ্ছে সংঘবদ্ধতা ও সার্বজনীনভাবে। এই সংঘবদ্ধতা একটি আকর্ষণীয় ও প্রগতিশীল প্রেরণা। কিন্তু ব্যক্তি ও তার যোগ্যতা সকল কাজ ও সংগঠনের ভিত্তি। এর গুরুত্ব ও প্রয়োজন সম্পর্কে কোনো যুগেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। বর্তমানকালের বিপজ্জনক ভুলটি হচ্ছে, ব্যক্তির গুরুত্ব এবং তার চরিত্র ও যোগ্যতার প্রতি কোনো নজর দেয়া হচ্ছে না। ইমারত নির্মাণ করা হচ্ছে কিন্তু যে ইট দ্বারা তা নির্মিত হচ্ছে, সে ইট কেউ দেখছে না। যদি কেউ প্রশ্ন করে বসে, প্রাসাদের ইটগুলো কেমন? তাহলে উত্তর দেয়া হচ্ছে ইটগুলো দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত; কিন্তু প্রাসাদটি হয়েছে খুব মজবুত ও উন্নত। আমাদের বিষয়টি বুঝে আসে না যে, শ খানেক ত্রুটিযুক্ত জিনিস মিলে একটি সুস্থ ও সুন্দর সমষ্টি কিভাবে তৈরি হতে পারে? অধিকসংখ্যক ত্রুটি যখন একটি অপরটির সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়, তখন কি অলৌকিকভাবে সেখান থেকে উত্তম কিছুর প্রকাশ ঘটে? শত শত অপরাধী ও অত্যাচারী এক সঙ্গে মিলে গেলে কি কোনো ন্যায়পরায়ন গোষ্ঠী কিংবা একটি ন্যায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হতে পারে? আমরা তো জানি, ফলাফল সব সময় সূচনার অনুগামী হয় এবং সমষ্টি হয় তার প্রতিটি এককের বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধি ও পরিচায়ক। আপনি বিশুদ্ধ দাঁড়িপাল্লা অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না তার পাথরটি বিশুদ্ধ হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িপাল্লা থাকবে অশুদ্ধ ও ত্রুটিযুক্ত। এটা কেমন যুক্তি ও দর্শন যে, ব্যক্তি গঠনের কোনো চিন্তা নেই অথচ একটি উত্তম সমষ্টি ও দলের প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

অন্যায় উদাসীনতা

বর্তমানে স্কুল-কলেজ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পর্যবেক্ষণাগার, বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে মানব জীবনের সকল বাস্তব ও কাল্পনিক প্রয়োজন পূরণ করার আয়োজন হচ্ছে। কিন্তু ওই মানুষগুলোকে মানুষরূপে তৈরি করার আয়োজন নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে না। তাহলে কি এসব আয়োজন ওই সকল লোকের জন্য যারা সাপ-বিচ্ছু হয়ে জীবন অতিবাহিত করবে, যাদের মাকসাদে জিন্দেগী অহমিকা ও বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এ যুগের মানুষেরা অত্যাচার ও অপরাধ সংগঠিতভাবে করে চলেছে এবং এক্ষেত্রে তারা হিংস্র জীব-জন্তুর চেয়েও বহুদূর এগিয়ে গেছে। সাপ-বিচ্ছু ও বনের বাঘ-সিংহ কি কখনো সংঘবদ্ধ ও সংগঠিতভাবে মানুষের ওপর হামলা চালিয়েছে? কিন্তু মানুষ তার মতো মানুষকে বিনাশ করার জন্য সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান করছে এবং সমস্ত দুনিয়া ধ্বংস করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। বর্তমানে ব্যক্তির প্রশিক্ষণ, তাঁর চরিত্র গঠন এবং

মানবিক গুণাবলী ও নৈতিকতা জন্মানোর প্রতি অন্যায় উদাসীনতা প্রদর্শন করছে। এ কাজকে মনে করা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বহীন। মেশিন বানানোর কত কারখানা আছে, কাগজ ও কাপড় তৈরির কত মিল আছে। কিন্তু প্রকৃত মানুষ বানানোর জন্য কি কোনো একটি প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণাগার আছে? আপনি বলবেন–এসব বিদ্যাপীঠ, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি এগুলো? কিন্তু বেয়াদবী মাফ করবেন, সেখানে মানবতা পুনর্গঠন এবং ব্যক্তির পরিপূর্ণতার প্রতি কতটুকু মনোযোগ দেয়া হয়? ইউরোপ ও আমেরিকা কত বিশাল ব্যয় ও আয়োজন করে এটম বোমা তৈরি করল। যদি এর পরিবর্তে একজন পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করতো, তাহলে পৃথিবীর কতই না উপকার হতো! কিন্তু এদিকে কারো খেয়াল যায় না।

আমাদের গাফিলতির জের

আমাদের ভারত উপমহাদেশে অতীতে বহু কালজয়ী ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছে। কিন্তু শতাব্দীকাল যাবত এদিকটি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। আমাদের বলতে হচ্ছে, মুসলমানরাও তাদের শাসনামলে এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন। তাদের শাসনকাল যদি খেলাফতে রাশেদার আদর্শে হতো এবং তারা যদি এতদ অঞ্চলের শাসক ও পরিচালক হওয়ার চেয়েও অধিক হতেন এদেশের নৈতিকতার শিক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক, তাহলে আজ দেশের নৈতিক অবস্থা এমন হতো না এবং তাদেরকেও এদেশের শাসন ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হতো না। এরপর ইংরেজ এসেছে, তাদের শাসনটা ছিল স্পঞ্জের মতো, যার কাজ হলো গঙ্গার পাড় থেকে সম্পদ চুষে চুষে টেমসের পাড়ে নিয়ে ভিড়ানো। তাদের আমলে এ দেশের নৈতিক অধঃপতন কোথায় থেকে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

বর্তমানে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। আমাদের উচিত ছিল, সর্বপ্রথম ওই মৌলিক বিষয়টির প্রতি নজর দেয়া। ভেবে দেখা উচিত, এদেশ কি একদিন স্বাধীন ছিল না? এরপর আবার স্বাধীনতার দৌলত থেকে কেন বঞ্চিত হয়েছিল? নিজেদের নৈতিক অধঃপতন ও নৈতিক স্খলনের জন্যই তো! কিন্তু আফসোস! সড়ক আর বিদ্যুতের প্রতি যতটুকু মনোযোগ দেয়া হচ্ছে এতটুকু মনোযোগও এই মৌলিক বিষয়টির প্রতি নেই।

প্রতিটি সংস্কারমূলক কাজের ভিত্তি

'আশ্রয়দান' ও 'ভূদান' আন্দোলনের যথেষ্ট মূল্যায়ন আমরা করে থাকি। কিন্তু আমরা তো এ বিষয়টি গোপন করতে পারি না যে, এরও পূর্বে করণীয় ছিল নৈতিক সংশোধন ও বিশুদ্ধ অনুভূতির জাগরণ। আমরা ইতিহাস পাঠে জানতে পারি অনেক প্রাচীন যুগে ভূসম্পত্তি বাধ্য-বাধকতার ভিত্তিতে বন্টন করা হতো। কোনো কোনো যুগ তো এমনও অতিবাহিত হয়েছে, যে যুগে বাতাস ও পানির

মতো ভূসম্পত্তিকেও একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস এবং মানুষের অধিকার হিসেবে সাব্যস্ত করা হতো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মানুষের লোভ-লালসা যাদের প্রয়োজন আছে তাদেরকে করেছে বঞ্চিত আর যাদের কোনো প্রয়োজন নেই তাদের বানিয়েছে মালিক। যদি নৈতিকতার অনুভূতি ও মনুষ্যত্বের মর্যাদা জন্ম না নেয়, তাহলে এ আশঙ্কা থেকেই যাবে যে, বন্টনকৃত জমি আবারও পুনঃদখল হয়ে যাবে এবং অভাবী মানুষকে উচ্ছেদ করা হবে জমি থেকে।

এজন্যই যতক্ষণ পর্যন্ত কথিত অনুভূতির জাগরণ ঘটবে এবং বিবেক ও অন্তর জাগ্রত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এসব প্রয়াসের ফলাফল এবং সমূহ প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা করা যায় না। বর্তমানে নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত। ঘুষ, চোরাকারবারী, প্রতারণা ও অবিশ্বস্ততার কোনো কমতি নেই, বরং লোকদের অভিযোগ হলো, এগুলো কিছুটা বেড়ে গেছে। সম্পদশালী হওয়ার বাসনা উন্মাদনায় রূপান্তর হয়েছে। কেউ নিজের দায়িত্ব অনুভব করছে না। মানসিক অবস্থাটা হচ্ছে এমন, একজনের ভালো কাজের আড়ালে অন্যজন মন্দ করতে চাচ্ছে। যখন সকলের অবস্থাই এমন হয়ে যাবে, তখন সেই ভালো কাজটি কোত্থেকে আসবে, যার আড়ালে মন্দটি লুকিয়ে রাখা যাবে?

আমার এক মিশরীয় বন্ধু তার ভাষণে এ প্রসঙ্গে একটি চমৎকার উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেন, একবার এক বাদশা ঘোষণা করলেন, 'দুধ ভর্তি একটি পুকুর চাই। রাতে প্রত্যেকেই এক লোটা দুধ এ গর্তে ঢালবে এবং সকালে এসে এর মূল্য নিয়ে যাবে।' কিন্তু তখন প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্নভাবে চিন্তা করলো 'আমি যদি সবার ফাঁকে এক লোটা পানি ঢেলে দিই, তাহলে কে জানবে? সবাই তো দুধ-ই ঢালবে।' ঘটনাক্রমে একই ভাবনা সবাই ভাবলো এবং অন্যের ভালো কাজ ও বিশ্বস্ততার আড়ালে নিজের মন্দটাকে চালিয়ে দিতে চাইলো। সকালে বাদশা দেখলেন, সম্পূর্ণ পুকুরটাই পানিতে ভর্তি হয়ে আছে। দুধের কোনো চিহ্ন নেই সেখানে। কোনো জনপদের অবস্থা যখন এমন হয়ে যায় তখন কেউ সে জনপদকে হিফাজত করতে পারে না।

মূল আশঙ্কা

মনে রাখবেন! এদত অঞ্চলের ধ্বংসের জন্য বাইরের আপাতত কোনো আশঙ্কা নেই। সবচেয়ে বড় আশঙ্কা হচ্ছে এই নৈতিক অধঃপতন, অপরাধসুলভ মানসিকতা, সম্পদপূজা ও ভ্রাতৃহনন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা কি শত্রুরা ধ্বংস করেছে? না–বরং সেই নৈতিক ব্যাধিগুলোই তাদের গ্রাস করেছে, যা ছিল দুরারোগ্য। তাছাড়া বর্তমানে যেকোনো একটি দেশের নৈতিক পতন সমস্ত পৃথিবীর জন্যই আশঙ্কার কারণ। পৃথিবী তখনই সুখী ও নিরাপদ হতে পারে যখন প্রতিটি দেশ সুখী ও নিরাপদ হবে।

নবী-রাসূলদের কীর্তিগাথা

গয়গাম্বরদের কীর্তি এটাই যে, তারা সৎ মানুষ গঠন করেছেন। খোদাভীরু, মানবপ্রেমিক, সহমর্মী, ন্যায়পরায়ন, সত্যবাদী, হকপন্থী, নিপীড়িতদের সাহায্যকারী ছিলেন তাদের গড়া মানুষ। পৃথিবীর অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা প্রশিক্ষণাগার এমন সৎ লোক জন্ম দিতে পারেনি। নিজের আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ওপর পৃথিবীর অহংকার আছে, বিজ্ঞানীরা তাদের অবদানের ওপর গর্ববোধ করে, কিন্তু আমরা একটু ভেবে দেখছি না, পয়গাম্বরদের চেয়ে অধিক মানবতার সেবা আর কেউ কি করেছে? তাদের চেয়েও মূল্যবান বস্তু পৃথিবীকে আর কেউ কি দান করেছে? তারাই তো দুনিয়াকে বাগিচা বানিয়েছেন। তাদের কারণেই পৃথিবী কর্মমুখর হয়ে উঠেছে এবং সকল সম্পদ চিনে নিয়েছে তার ঠিকানা।

আজও দুনিয়াতে ভাল কাজের যে প্রবণতা, সততা, ন্যায় ও মানবপ্রেম পাওয়া যায় তা পয়গাম্বরদেরই প্রচেষ্টা ও তাবলীগের ফসল। বর্তমান পৃথিবীও নিছক আবিষ্কার ও সভ্যতার উন্নয়নের কাঁধে সওয়ার হয়ে চলতে পারে না। বরং আজকের পৃথিবীটাও শুধুমাত্র সেই সততা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়নতা এবং ভালোবাসার ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, যার জন্ম দিয়ে গেছেন পয়গাম্বরগণ।

নবী-রাসূলদের কর্মকৌশল

পয়গাম্বরগণ এই সৎ মানুষ কিভাবে জন্ম দিয়েছেন? একথা কম বিস্ময়কর নয় যে, তারা মানুষের হৃদয়ে এমন একটি নতুন বিশ্বাস জন্ম দিয়েছেন, যে বিশ্বাস থেকে দীর্ঘকাল বঞ্চিত থাকার ফলে পৃথিবীর সকল ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়েছিল এবং মানুষ ও মানুষের সমাজ হিংস্র পশু ও ক্ষমতালিপ্সু জন্তুতে পরিণত হয়েছিল। সে বিশ্বাসটি ছিল–আল্লাহর সত্তা একক, মৃত্যুপরবর্তী জীবন, জবাদিহীর বিশ্বাস এবং এই পয়গাম্বরের প্রতি এ বিশ্বাসও তাদের মাঝে প্রোথিত করা হয়েছিল যে, ইনি সত্যবাদী মানুষ, আল্লাহর হক পয়গামের বাহক এবং মানবতার সঠিক পথপ্রদর্শক। এই বিশ্বাস মানুষের কায়া সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে এবং তাকে উন্নীত করেছে একটি লাগামহীন জন্তুর স্তর থেকে একজন দায়িত্ববান মানুষে।

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা

হাজারো বছরের অভিজ্ঞতা বলে, মানুষ গড়ার জন্য ব্যক্তি গঠনের এই প্রক্রিয়ার চেয়ে বড় কোনো শক্তি নেই। আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হচ্ছে, বিভিন্ন দল আছে, গোষ্ঠী, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান আছে; কিন্তু সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি নেই। পৃথিবীর বাজারে এ বস্তুরই অভাব সর্বাধিক। আশঙ্কাজনক বিষয় হচ্ছে, এ

ক্ষেত্রে প্রস্তুতি গ্রহণের কোনো ভাবনাও নেই। সত্যি করে জিজ্ঞেস করলে বলতে হবে, এ বিষয়ে প্রস্তুতির প্রচেষ্টাও যে দু'একটা হচ্ছে তাতেও যথার্থ পথটি বেছে নেয়া হচ্ছে না। এর পথ শুধুমাত্র একটিই, তা হলো–আবারো বিশ্বাস জন্মানো। মানুষকে মানুষ বানানো ছাড়া অপরাধ বন্ধ হতে পারে না। আপনি একটি চোরাপথ বন্ধ করবেন তো দশটি চোরাপথ খুলে যাবে। আফসোসের বিষয় হচ্ছে, এই মৌলিক কাজের প্রতি যাদের মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন, যাদের মনোযোগে প্রভাব পড়ে, অন্য সমস্যার কারণে তারা সুযোগ পায় না। তারা যদি এদিকে মনোযোগ দিতেন তাহলে এর ফলে সমগ্র জীবনাচারেই তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়তো এবং যেসব সমস্যা থেকে নিষ্কৃতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রচেষ্টা চালানোর পরও আশাব্যঞ্জক কোনো ফলাফল দেখা যাচ্ছে না, সে সব রহস্য-সমস্যা থেকেও সকলের উত্তরণ ঘটতো এবং নিষ্কৃতি মিলতো।

আমাদের উদ্যোগ ও প্রয়াস

আমরা যখন দেখলাম, বিশাল এই দেশে কেউ ঘোষকের ভূমিকা পালন করছেন না, কেউ এটাকে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করছেন না, তখন আমরা কয়েকজন নিঃস্ব সঙ্গী এ আহবানের জন্য নিজেদের ঘর ছেড়ে এসেছি। আমরা আপনাদের শহরে এসেছি। আপনারা আমাদেরকে গ্রহণ করেছেন এবং অত্যন্ত আগ্রহ ও ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের কথা শুনেছেন। এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের দারুণ উৎসাহ জেগেছে। আমরা এ ময়দানে নেমেছি, মানবতার বিস্তৃত বসতিতে অবশ্যই কিছু জীবন্ত প্রাণের সন্ধান মিলবে। পৃথিবীর সকল কাজ এ ধরনের মানুষের অস্তিত্বের বিশ্বাস এবং প্রাণ সজীবতার ওপর নির্ভর করেই করা হয়েছে। বিশাল এই সম্মেলনে আমাদের প্রত্যাশা, অনেকগুলো অন্তর আমাদের এ কথাকে গ্রহণ করবে।

আমরা এটাও প্রত্যাশা করি যে, যারা আমাদের একথা শুনেছে তারা নিজেদেরকে এ ধরনের ব্যক্তিরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে, আজকের পৃথিবীতে এ ধরনের ব্যক্তির বড়ই প্রয়োজন, যে ধরনের ব্যক্তির অভাবে জীবন তার নির্ধারিত ছকে চলতে পারছে না।

আমার কুরআন অধ্যয়ন

সূচনা পর্ব

মুসলিম সমাজে প্রচলিত কুরআন শিক্ষার স্বাভাবিক পদ্ধতিতেই আমি নাজেরা পড়া শুরু করি। দেখে দেখে ভালোভাবে পড়তে পারার পর থেকে তেলাওয়াত করি। তবে বুযুর্গানে দীনের তাগিদ থাকা সত্ত্বেও নিয়মিত তা করতে পারি না। যখন আমার আরবী শিক্ষার সূচনা হয় এবং আরবী কিছু কিছু বুঝি তখই কুরআন মজীদের আয়াতের অর্থ মোটামুটি বুঝতে পারি। আমার উস্তাদ শায়খ খলীল ইবনে মুহাম্মদ আরব রহ. কুরআন মজীদের ক্ষেত্রে অগাধ জ্ঞান রাখতেন। অধিকাংশ সময় তিনি আমাদের মসজিদে ফজরের নামায পড়াতেন। তাঁর বংশীয় সম্পর্ক আরবের ওই গোত্রের সঙ্গে ছিল, যে গোত্রের ব্যাপারে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের কাছে যখন ইয়ামেনবাসী আসবে তখন দেখবে তাদের অন্তর স্বচ্ছ ও কোমল।' আল্লাহ তাআলা তাঁকে একটি কোমল হৃদয় দান করেছিলেন। কুরআন মজীদ তেলাওয়াতের সময় তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারতেন না, নিজের অজান্তেই দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকতো। গলার স্বর পরিবর্তন হয়ে যেতো, ভেতরের বিরাজমান আবেগ ও উচ্ছ্বাসের তাড়নায় অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ধ্বনির প্রকাশ ঘটতো। আমার ভালভাবে স্মরণ আছে, ফজরের নামাযে তিনি শেষ পারার কোনো বড় সূরা শুরু করতেন কিন্তু ভাবের অতিক্রিয়া এবং কান্নার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে তা শেষ করার সুযোগ খুব কমই পেয়েছেন। শ্রোতাদের আফসোস থেকেই যেতো যে, তারা পুরো সূরা শুনতে পারছে না।

সুযোগ্য উস্তাদ

আমার কুরআন শিক্ষার সূচনাও মুহতারাম ওই উস্তাদের কাছে হয়। তাওহীদের ব্যাপারে তিনি আপসহীন ও আকীদার ব্যাপারে খুই পরিষ্কার ও স্বচ্ছ ছিলেন। ছাত্রদেরকেও তিনি আকীদার ক্ষেত্রে তাঁর মতো বানাতে চাইতেন। আল্লাহ তাআলার

বিশেষ করুণা যে, তিনি আমাকে এরূপ বিশুদ্ধ আকীদার এক বুযুর্গের কাছে পড়ার তাওফীক দান করেছেন। সূরা যুমার যাতে-তাওহীদের সুস্পষ্ট ও জোরালো শিক্ষা রয়েছে-তাঁর কাছে খুই প্রিয় ও নির্বাচিত সূরা ছিল। আমরা যখন আরবীতে কিছুটা পাঙ্গমতা অর্জন করলাম তখন তিনি আমাদেরকে এই সূরার দরস দেন। এরপর সূরা মুমিন ও সূরা শূরার দরস দেন। নির্দিষ্ট কিছু রুকুর ব্যাপারেও তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ও মহব্বত ছিল, যা তিনি খুবই উৎসাহের সঙ্গে তেলাওয়াত করতেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকু 'ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি' যার ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সা. যখন শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন তখন নামাযের পূর্বে এই আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতেন। এছাড়া সূরা ফুরকানের শেষ রুকু 'ওয়া ইবাদুর রাহমানিল্লাযিনা' এর কথা মনে আছে। শায়খ খলীল বিন আরব রহ. এর মোহনীয় কণ্ঠ এখনও যেন কানে গুঞ্জরিত হচ্ছে। তাঁর থেকে শুনতে শুনতে আমারও এই রুকুসমূহ ভালোভাবে মুখস্থ হয়ে যায়। আর এভাবেই কুরআন মজীদের প্রতি আমার ঝোঁক ও সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

কুরআন মানবতার দর্পন

যখন আরবীতে যোগ্যতা সৃষ্টি হলো তখন তেলাওয়াতেও মন বসতে লাগল। এ সময় আমাদের বংশে এমন কিছু অবস্থার সৃষ্টি হলো যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কুরআন মজীদের তাফসীর হয়ে যেত। আর এটা স্পষ্ট হয়ে যেত যে, আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞাপূর্ণ নেযামসমূহ পূর্ণাঙ্গ ও অদ্বিতীয়। জাতিসমূহের উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে তাঁর চাওয়া ও কুদরতি ইশারা খুবই কার্যকর। আর 'আল্লাহ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ সে জাতি নিজের ভাগ্য নিজেরা পরিবর্তন না করে'-একথা একটি চিরন্তন সত্য।

ওই সময় কুরআন মজীদের তেলাওয়াতে এটা স্পষ্টভাবে অনুভূত হতে থাকল যে, এটি একটি জীবন্ত কিতাব। জীবিত মানুষের ঘটনা ও কাহিনীই এতে বিবৃত হয়েছে। জীবনের একটি সুস্পষ্ট মানচিত্র এতে এঁকে দেয়া হয়েছে, যাতে প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ ঠিকানা খুঁজে পেতে পারে।

সূরা আম্বিয়ার আয়াত 'লাকাদ আনযালনা ইলাইকুম কিতাবান ফিহি যিকরুকুম' এর বিভিন্ন তাফসীর রয়েছে। তন্মধ্যে একটি তাফসীর হচ্ছে 'ফিহি হাদীসুকুম'(এতে তোমাদের আলোচনা রয়েছে)। এর ওপর ভিত্তি করেই প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত আহনাফ ইবনে কায়স রহ. একদিন এ আয়াত শুনে কুরআন শরীফ চাইলেন এবং বললেন, কুরআন শরীফ আন, আমি দেখিয়ে দেব কোন আয়াতে আমার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। কয়েক পৃষ্ঠা উল্টিয়ে এক স্থানে গিয়ে তিনি থেমে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, আমার আলোচনা আমি পেয়ে গেছি। সে আয়াতটি ছিল 'ওয়া আঁখারুনা'তারাফু বিযুনুবিহিম...' (তওবা-১০২)

এটা আমার ভালভাবেই নজরে ভাসতে থাকল যে, এই বিস্ময়কর কিতাবের মধ্যে জাতি, গোত্র ও ব্যক্তিসমূহের ওপর আলোকপাত এবং তাদের উত্থান-পতনের কারণ ও দর্শন বিদ্যমান। নিজের সীমাবদ্ধতা ও স্বল্প জ্ঞানের কারণে যেহেতু জাতিসমূহের ইতিহাসের ওপর নজর ছিল না এবং জানার পরিধি সীমিত ছিল এজন্য নিজের বংশ এবং পরিচিত গণ্ডির ভেতরে যাচাই করে কুরআনে কারীমের সত্যতা স্পষ্ট হয়নি। তবে ওই সময়ও আমি সূরা মায়েদা, সূরা আনআম এবং সূরা আরাফ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আগ্রহভরে পড়তাম।

অদৃশ্যের মদদ

আমার শিক্ষাজীবনের একটি বিস্ময়কর মুহূর্ত যাকে আমি শুধু শুভ মুহূর্ত হিসেবেই নয় বরং অদৃশ্যের মদদপুষ্ট বলে থাকি, আমি প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান পৃথক পৃথকভাবে অর্জন করেছি। মিশ্রিত সিলেবাস পড়ার সুযোগ আমার হয়নি। আমাদের প্রাজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উস্তাদ আল্লামা খলীল আরব রহ. সর্বপ্রথম আমাকে আরবী সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ পাঠদান করেন। সুতরাং লাগাতার তিন বছর আরবী ভাষার প্রাথমিক পাঠ্য নাহজুল বালাগা, হামাসা এবং দালায়েলুল এজাজ ইত্যাদি কিতাব পড়তে থাকি। বিষয়পারদর্শী উস্তাদের সোহবতের ফায়েজ এবং আরবী সাহিত্যের সঙ্গে দিবানিশি সম্পর্ক রাখার কারণে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে এমন গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল যে, এর ভাল-মন্দের পরখ করা এবং তা পাঠের সুখ্যতা অনুভূত হতে থাকল। তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণ কথা বুঝতেও কোনো দলীলের প্রয়োজন রইল না। এর ফলে কুরআন মজীদের অলংকারসৌন্দর্য পরখ করার যোগ্যতা হাসিল হয়ে গেল। কোনো উপকরণের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়াই স্বতঃসিদ্ধভাবে তা অর্জন হয়।

কুরআনের প্রতিটি শব্দ ডাক দিয়ে বলছে, এটি আল্লাহর কালাম, সমস্ত দুনিয়ার অস্বীকৃতি এবং সন্দেহও এতে বিন্দু পরিমাণ প্রভাব ফেলতে পারবে না। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কের এই ফায়েজ সামান্য কোনো বিষয় নয়। এর দ্বারাই কুরআনের প্রতি প্রবল ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছে এবং কুরআনকে সমস্ত আরবী সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ ও অনন্য ভাণ্ডার মনে হয়েছে। এই অপার্থিব ফয়েজ ও বরকতের জন্য আমি আমার মুহতারাম উস্তাদ এবং আমার মুরব্বী ও বড় ভাইয়ের কৃতজ্ঞতার ডোরে আবদ্ধ থাকব।

আমার অনুভূতি

আমার মতে আমাদের দীনী মাদরাসাসমূহে যেভাবে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষা দেয়া হয় এর দ্বারা তেমন কোনো ফায়দা হাসিল হয় না। ভাষার প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি করতে এবং ভাষার সৌরভে মোহিত হওয়ার ক্ষেত্রে পুরনো সিলেবাসের নিষ্প্রভ কিতাবসমূহ বেকার। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অধঃপতনের সময় রচিত কিতাবসমূহ বিশেষত যা অনারবী বংশোদ্ভুত লেখকের লেখা, শব্দ ও বাক্যের বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কিতাবসমূহের দ্বারা অলংকারের আঙ্গিকে কুরআন মজিদের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানো প্রায় অসম্ভব। কোথাও এর অন্যতা হলে বুঝতে হবে এটা অস্বাভাবিক ও সহজাত ধারার পরিপন্থী। আল্লামা শায়খ খলীল আরব রহ. এর প্রণীত ও আবিস্কৃত সাহিত্যের নেসাব পূর্ণ করার পর সৌভাগ্যক্রমে আমি আল্লামা তাকী উদ্দীন হালালী মারাকাশী রহ. এর সোহবত লাভ করি, যিনি আরবী ভাষা ও ব্যাকরণে তৎকালীন যুগে অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁকে এ বিষয়ের ইমাম বলা যেতে পারে। আরবী সাহিত্যের জ্ঞান হাসিলের পর আমি ফিকাহর কিছু জ্ঞান লাভ করি এবং দুই বছর দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামায় মাওলানা হায়দার হাসান খান সাহেবের হাদীসের দরস সমাপ্ত করি। ওই সময় তাফসীরে বায়যাবী শরীফের কিছু অংশ তাঁর কাছে পড়ি। জনাব খান সাহেব দরসে নেজামীর একজন খ্যাতিমান উস্তাদ ছিলেন। কিছুদিনের জন্য আমি লাহোরে গিয়ে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্দী রহ. এর পদ্ধতিতে তাঁর সুযোগ্য শাগরেদ মাওলানা আহমদ আলী সাহেবের তাফসীরের দরসে শরীক হই। সেই দরসে কুরআনে কারীম থেকে রাজনৈতিক তীক্ষ্ণ কথা বের করার প্রাবল্য ছিল। এই পদ্ধতির সঙ্গে আমার খুব একটা সম্পৃক্ততা গড়ে উঠেনি। কিন্তু তাঁর আখলাক, পরহেজগারীর জিন্দেগী এবং তাওহীদের জযবা দ্বারা আমি বেশ উপকৃত হয়েছি।

তাফসীরের মুতালায়া

লাহোর থেকে প্রত্যাবর্তন এবং হাদীসের ইলম হাসিল থেকে ফারেগ হওয়ার পরের সময় আমি তাফসীর মুতালায়ায় কাটিয়েছি। আমি একথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত তাফসীর এবং মাওলানা হুমাইদুদ্দীন ফারাহী এর পুস্তকও পড়েছি। এরপর সবটুকু সময়ই পুরনো তাফসীর মুতালায়ায় কাটিয়েছি। অধিকাংশ সময় নিজে মুতালায়া করতাম এবং যেখানে বুঝতে সমস্যা হতো সেটুকু অন্য কোনো কিতাব থেকে বুঝতে চেষ্টা করতাম। ওই সময় তাফসীরে জালালাইন, আল্লামা বগবীর তাফসীর 'মাআলিমুত তানজীল', আল্লামা যমখশরী রহ. এর কাশ্‌শাফ শব্দে শব্দে পড়েছি। আল্লামা নসফী রহ. এর মাদারেকের অর্ধাংশ আমার প্রায় মুখস্থ। শব্দে শব্দে মুতালায়া করেছি। তাফসীরের মুতালায়ার ক্ষেত্রে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, তাফসীরের কোনো একটি কিতাব মুতালায়া করে কেউই তৃপ্ত হবার নয়। কারণ মানুষের মেধা ও ধারণ ক্ষমতায় এত ভিন্ন ও পার্থক্য যে, এক ব্যক্তি সবাইকে এক সঙ্গে সন্তুষ্ট করতে পারে না। অনেক

সময় একজন অপেক্ষাকৃত কম মেধাসম্পন্ন লোকেরও এমন কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যা কোনো মেধাবী লোকেরও হয় না। সে এ ধরনের জিজ্ঞাসা এড়িয়ে চলে যেতে পারে। আমার অনেক প্রশ্ন ও সন্দেহ প্রসিদ্ধ তাফসীরসমূহে নিরসন করতে পারিনি। কোনো হাশিয়া (টিকা) অথবা অজ্ঞাত কোনো তাফসীর থেকে তা নিরসন করতে পেরেছি। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করলে কলেবর বেড়ে যাবে।

দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামায় কুরআন মজীদের দরসের দায়িত্ব যখন এই অধমের কাঁধে পড়ল তখন গভীরভাবে তাফসীর মুতালায়া করার সুযোগ হয়। ওই সময় আল্লামা আলুসী রহ. এর তাফসীরে রূহুল মাআনী থেকে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি। এটা অভিজ্ঞতা হলো যে, তাফসীরে কাবীরের ব্যাপারে আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে যে খারাপ ধারণা রয়েছে, এমনকি বলা হয়ে থাকে 'তাফসীরে কাবীর আর যাই হোক তাফসীর নয়' মূলত এই তাফসীরগ্রন্থটি কোনোক্রমেই এ ধরনের অবজ্ঞার উপযুক্ত নয়। অতিরিক্ত জিনিস অনেক থাকলেও কাজের বিষয়ও অনেক আছে। এর মধ্যে এমন এমন বিষয়সমূহ বিদ্যমান যা সাধারণ কিতাবসমূহে পাওয়া যায় না। শিক্ষকতার ওই সময়ে যদিও মাঝে মাঝে অন্যান্য তাফসীরগ্রন্থও দেখার সুযোগ হয়েছে, যেমন আবুল হাইয়ান রহ. এর 'আল বাহরুল মুহীত'; তবে এর বিশেষ কোনো প্রভাব পড়েনি। আল্লামা রশীদ রেজা রহ. এর তাফসীর 'আল মানার'ও একটি উপকারী তাফসীর। বিশেষত আধুনিক বিষয়াবলী সম্পর্কে এতে বড় ধরনের সাহায্য পাওয়া যায়। দরসদানের ক্ষেত্রে 'জুমাল' তাফসীরটিও বেশ ভাল। ইযাযুল কুরআন দ্বারাও উপকৃত হয়েছি।

অমূল্য তাফসীরগ্রন্থ

ওই সময় পর্যন্ত আল্লামা আব্দুল মজীদ দরিয়াবাদীর তাফসীরে মাজেদী বের হয়নি। ইংরেজিতে এর হাশিয়া লেখা হচ্ছিল। আমার অনেক প্রশ্ন যেগুলো প্রাচীন ইতিহাস ও অন্যান্য ধর্মসংশিষ্ট ছিল, এর সমাধানের জন্য আমাকে কখনো কখনো দরিয়াবাদ যেতে হতো। অনেক অজানা বিষয় জানতে পারতাম। বর্তমানে এসব বিষয় তাফসীরে মাজেদীতে বিদ্যমান। কুরআনে পাকের তালেবে ইলমদের জন্য এ তাফসীরগ্রন্থটি মুতালায়া করা খুবই জরুরী। বিশেষত ওই লোকদের জন্য যারা বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করার সময় থাকে না।

দরসদানের কাল অতিবাহিত হওয়ার পর যখন অনেক প্রয়োজনে তাফসীরে তাবারী দেখার সুযোগ হয়েছে তখন আমার চক্ষু খুলে গেছে এবং মনে হয়েছে এটি শুধু তাফসীরই নয় বরং ইতিহাস ও সাহিত্যেরও একটি বিশাল ভাণ্ডার,

যার কাছে এ তাফসীরগ্রন্থটি সংগৃহিত রয়েছে তিনি বিরাট এক নেয়ামত অর্জন করেছেন। আরবের জাহেলী যুগের আচরণ, তাদের ধর্ম বিশ্বাস, জীবনাচার এবং কুরআনে পাকের পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা জানার জন্য এর চেয়ে উপযোগী কোনো সংকলন নেই।

বিরল এক তাফসীরগ্রন্থ

এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ ও অসার হয়ে যাবে যদি একটি কিতাবের কথা উল্লেখ না করি। কিতাবটি যদিও খুব বড় নয় তবে কুরআন বুঝার জন্য একটি আদর্শ কিতাব। তাফসীরের ছাত্রদের জন্য একটি অমূল্য উপহার। হয়ত অনেক পাঠকের মাথায় কিতাবটির পরিচয় এসে গেছে। সেটি হচ্ছে হযরত শাহ আব্দুল কাদের রহ. এর তরজমাতুল কুরআন। এর মূল্যায়ন ওই লোকদের কাছে হবে যারা তাফসীর শাস্ত্রের বিস্তারিত ও উচ্চতর বিষয়ে অধ্যয়ন করেছেন, যাদের কাছে কুরআনের কঠিন স্থানসমূহের জ্ঞান আছে। উপরন্তু এটাও জানা আছে যে, তাফসীরকারকদের কুরআন মজীদের মর্মার্থ ও এর কিছু শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত হওয়ার পর যখন শাহ সাহেবের তরজমা পড়বে তখন সে অনুমান করতে পারবে, তিনি কত সফলতার সঙ্গে সব সমস্যার সমাধান করেছেন। আর কুরআনে কারীমের সমার্থক হিসেবে কী ধরনের উর্দূ শব্দ চয়ন করেছেন। অনেক সময় মনে হয় এগুলো একদম ইলহামী।

এর উদাহরণ হিসেবে মাত্র একটি আয়াত পেশ করব। সূরা শূরার একটি আয়াত আছে 'কালু বিইজ্জাতি ফিরআউনা ইন্না লা নাহনুল গালিবীন।' আরবীতে ইজ্জত শব্দটি শুধু বিজয়ীরও সমার্থক না আবার শুধু আভিজাত্যেরও সমার্থক না। এখানে এই দুটি শব্দ মিলেও এর মর্মার্থ আদায় করতে পারে না। আল্লামা যমখশরী রহ. এর মতো অনন্য ও প্রাজ্ঞ আদীবের দ্বারাও এর একক সমার্থক কোনো শব্দ বের করা সম্ভব হয়নি।

হযরত শাহ সাহেব রহ. এ শব্দটির যে তরজমা করেছেন তাতে এর মূল স্পিরিট এসেছে। তিনি তরজমা করেছেন 'এবং বলুন, ফেরআউনের সৌভাগ্য থেকে আমিই শক্তিশালী'। এটাই এই আয়াতের সঠিক অর্থ। তার পরে যারাই এই আয়াতের তরজমা করেছেন, তারাই শাহ সাহেবের কৃত অর্থের অনুসরণ করেছেন। এটি একটি মাত্র উদাহরণ। শাহ সাহেবের তরজমায় এমন অনেক তীক্ষ্ণ ও মূল্যবান বিষয় পাওয়া যায়। আমাদের উস্তাদ মাওলানা হায়দার হাসান খান রহ. বলতেন, মাজাহেরুল উলূম সাহারানপুরের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মাজহার হাসান নানুতবী রহ. সকল তাফসীর পড়ানোর পরে শাহ সাহেবের তরজমা পড়াতেন।

তেলাওয়াতই কুরআনের প্রাণ

এই ইলমী অভিজ্ঞতায় এতটুকু বাড়াতে চাই যে, কুরআন মজীদ বুঝার আসল দরজা যখন খুলে যায়, যখন মানুষ মানবিক কোনো পর্দা ছাড়াই এই কালামের দ্বারা কালামের স্রষ্টার সঙ্গে কথোপকথন করে–এ সবের রাস্তা হচ্ছে বেশি বেশি আল কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করা। যিনি এ কিতাবের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করেছেন, যার রগ-রেশায় এ কালাম বসে গেছে, তার সান্নিধ্য অর্জন করা। প্রয়োজন হলো যিনি পড়বেন তিনি যেন এই কিতাবের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অবগত হয়ে এমন ধারণা করেন যে, তিনিই সরাসরি সম্বোধিত। আল্লামা ইকবাল যথার্থই বলেছেন, 'তোমার দেলের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত এই কিতাব অবতীর্ণ না হবে, ততক্ষণ ইমাম রাযী কিংবা তাফসীরে কাশশাফের লেখক কেউই এর মর্মার্থ উদঘাটন করে দিতে পারবে না।'

প্রবৃত্তিপূজা বনাম স্রষ্টার ইবাদত

আমি আজ আপনাদের সামনে মন খুলে কিছু কথা বলতে চাই। আর এমনভাবে বলতে চাই যেমন আমি আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে বলছি। বাস্তবে যদি এটা সম্ভব হতো যে, প্রত্যেকের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে মনের কথা বলতে পারতাম, তাহলে আমি নিঃসন্দেহে তা করতাম। যেন আপনারা এটা ভাষণ হিসেবে নয় বরং দরদী এক বন্ধুর হৃদয়ের ব্যথা মনে করে শোনেন। কিন্তু কী করব? এটা তো বাস্তবে সম্ভব নয়। এটা যদি সম্ভব হতো তবে নির্বাচনী প্রার্থী অবশ্যই এটার ওপর আমল করতো। নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে তারা কোনো মিটিং-সমাবেশ করতো না। কারণ, নির্বাচনী সভায় যে কথাগুলো বলা হয় সেগুলো নিভৃতে গিয়ে কাউকে বলাটাই অধিক ফলপ্রসূ ও যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ নিজের গুণকীর্তন করা, নিজের যোগ্যতা প্রকাশ করা এবং নিজের শানে নিজেই কাব্য রচনা করার মতো কাজ তারা করে। এজন্য আমি আপনাদের সামনে এতটুকুই প্রার্থনা করতে পারি যে, অনুগ্রহ করে আমার নিবেদনগুলোকে আপনারা কোনো মঞ্চের বক্তৃতা মনে না করে হৃদয়ঝরা কথা মনে করে শুনবেন।

প্রবৃত্তিপূজা নাকি আল্লাহপ্রেম

দুনিয়ার জীবন-যাপনের বহু পথ ও বিচিত্র ধারা রয়েছে। মনে করা হয় জীবন বর্ণিল ও বহু ভাগে বিভাজ্য। প্রাচ্যের জীবন, পাশ্চাত্যের জীবন, আধুনিক জীবনধারা, প্রাচীন জীবনবোধ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে জীবনের মৌলিক প্রকার মাত্র দুটি–এক.রিপু ও প্রবৃত্তিপূজারী জীবন, দুই. আল্লাহপ্রেমী জীবন। অন্যান্য যত প্রকার আছে বিচিত্র নামে খ্যাত–এর সবগুলোই এ দু'প্রকারের শাখা-প্রশাখা।

প্রথম প্রকার জীবন হচ্ছে, মানুষ নিজেকে নিজে লাগামহীন উট মনে করে জীবন যাপন করে এবং মনে যা আসে তাই করে বসে। এটাকে মনচাহি জীবনও বলা

যেতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার জীবন হচ্ছে, এমন মানুষের জীবন যিনি একথা বিশ্বাস করেন যে, তাকে কেউ সৃষ্টি করেছেন এবং ওই সৃষ্টিকর্তাই তার জীবনের মালিক ও শাসক। তিনিই তার প্রয়োজন, সুযোগ-সুবিধা ও মঙ্গল সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত। সেই সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে জীবন-যাপনের এমন কিছু নিয়ম-নীতি ও ধারা রয়েছে যার অনুসরণ করা অপরিহার্য।

প্রবৃত্তিপূজা সব সময় স্রষ্টার বন্দনা থেকে প্রাধান্য

হিন্দুস্তানে 'মহাভারত' নামে অনেক বড় একটি ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব হয়েছে। মহাভারতের ঐতিহাসিক বিবেচনা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই। কিন্তু এই পৃথিবীতে অন্য আরেকটি মহাভারতের সন্ধান পাওয়া যায়। এটি হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ মহাভারত থেকেও প্রাচীন। এটা ওই দ্বন্দ্ব যা খোদাপ্রেম ও প্রবৃত্তিপূজার মাঝে সর্বদাই বিরাজমান। এ দ্বন্দ্ব একক কোনো রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ নয় বরং এর অস্থিত্ব বাড়ি-ঘরেও পাওয়া যায়। এটি মূলত জীবনের দুটি ধারা যা সর্বদা একে অপরের ওপর বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করে আসছে।

আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলেরা নিজ নিজ সময়ে প্রত্যেক স্থানে স্রষ্টার বন্দনার দাওয়াত দিয়ে এসেছেন। তাদের সফলতার যুগে সেই প্রকার জীবনেরই প্রাবল্য ছিল। কিন্তু প্রবৃত্তিপূজা স্থায়ীভাবে কখনও বিলুপ্ত হয়নি। বরং যখনই সুযোগ পেয়েছে, তখনই জীবনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের যুগ সেই যুগ যে যুগে প্রবৃত্তিপূজা সম্পূর্ণরূপে জীবনের ওপর চেপে আছে। জীবনের প্রতিটি শাখা, প্রতিটি ময়দান তার গ্রাসে পরিণত হয়ে গেছে। বাড়ি-ঘরে প্রবৃত্তিপূজা, হাট-বাজারে প্রবৃত্তিপূজা, অফিস আদালতে প্রবৃত্তিপূজা, মিল-কারখানায় প্রবৃত্তিপূজা–যেন এটি এমন এক সমুদ্র যা গোটা স্থলভাগ প্লাবিত করে ফেলেছে এবং আমরা তাতে গলা পর্যন্ত ডুবে আছি।

প্রবৃত্তিপূজা স্বতন্ত্র একটি ধর্ম

বর্তমানে প্রবৃত্তিপূজা স্বতন্ত্র একটি ধর্মে পরিণত হয়েছে। না, শুধু এতটুকুই নয় বরং এর ধরণটা সব সময় এমনই হয়ে থাকে এবং এ ধর্মের অনুসারী সংখ্যা হয়ে থাকে বেশি। অন্য সকল ধর্মের তালিকায় এ নামের উল্লেখ করা হয় না। এ ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যারও কোনো হিসাব-নিকাশ নেই। কিন্তু স্বস্থানে বাস্তবতা হচ্ছে, এটাই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ধর্ম। আর এর অনুসারীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। আপনার কাছে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের একটা হিসাব আসে–খৃষ্টান ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা এত, ইসলামের অনুসারী এত এবং হিন্দু ধর্মের অনুসারী এত। তবে এদের সকলের মধ্য থেকেই একটি বড় সংখ্যা সেইসব লোকের যারা বলে আমি ধর্মের পরিচয়ে খৃষ্টান, হিন্দু অথবা মুসলমান। কিন্তু মূলত তারা সেই প্রবৃত্তিপূজারী ও আত্মপূজার ধর্মেরই অনুসারী। প্রবৃত্তিপূজা ও আত্মপূজা জীবনের প্রচলন এবং এর গ্রহণযোগ্যতা শুধু এ কারণেই যে, এতে মানুষ বেশি মজা পায়। প্রবৃত্তিপূজার জীবন অত্যন্ত উপভোগ্য ও আনন্দময় জীবন–একথা মানলাম, প্রত্যেক মানুষের সহজাত চাহিদাও থাকে সুখ উপভোগ করা, কিন্তু যদি পৃথিবীর সকল মানুষকে সামনে নিয়ে ভেবে দেখা হয়, তাহলে এ ধরনের জীবন পৃথিবীর জন্য একটি অভিশাপ, অন্য কিছুই নয়। পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা, সকল যন্ত্রণা এই প্রবৃত্তিপূজারই ফসল। দুনিয়ার সমস্ত ধ্বংস, সমস্ত সংকট, সমস্ত অনাচারের দায় সেইসব লোকের ওপরই বর্তায়, যারা অশুভ এই ধর্মের অনুসারী।

এই পৃথিবীতে প্রবৃত্তিপূজার এ ধর্মের অবকাশ শুধু সেই অবস্থাতেই ঘটতে পারে, যখন গোটা পৃথিবীতে শুধু একজন মানুষেরই অস্থিত্ব থাকে। কেবলমাত্র সেই অবস্থাতেই সে নিজের মনের বাসনাকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে পূরণ করার অধিকার রাখে। কিন্তু বাস্তবতা তো এমন নয়। এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এখানে কোটি কোটি মানুষের বসতি বানিয়েছেন এবং তাদের সকলের সঙ্গেই মনের চাহিদা এবং মনের প্রয়োজনীয়তা জড়িয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তিই মনচাহি জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করে, সে এই বাস্তবতা থেকে যেন চোখ বন্ধ করে রাখে যে, তার সাথে তারই সমজাতীয় আরো অনেকেই রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা থেকে চোখ বন্ধ করে রাখলে বাস্তবতা তো ভুল প্রমাণিত হয় না। বাস্তবতা তার আপন জায়গাতেই টিকে থাকে। এ কারণেই কিছু লোকের প্রবৃত্তি ও আত্মপূজার ফলাফল নিশ্চিতরূপে অন্যের জন্য দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে আসে।

প্রবৃত্তিপূজারী মনের রাজা

প্রবৃত্তিপূজারী জীবন-যাপনকারী হয়ে থাকে মনের রাজা। মনের রাজার অবস্থা হচ্ছে, সমস্ত পৃথিবীজুড়ে প্রবৃত্তির একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার লাভ করেও যার মোটেও পেট ভরে না। সে এর চেয়েও অধিক সম্পদের লোভ করে থাকে। ভেবে দেখুন, যখন এই সমগ্র জগতও একজনমাত্র মনের রাজার আত্মায় প্রশান্তি আনতে যথেষ্ট হয়নি, তখন এক এক বাড়ির সীমিত পৃথিবীতে যে একাধিক মনের রাজা বিদ্যমান, তারা কিভাবে প্রশান্তি ও স্বস্থি পেতে পারে। এই প্রবৃত্তিপূজার ব্যাধি প্রতিটি বাড়িতে চার চারটি মনের রাজা তৈরি করেছে। বাপ মনের রাজা, মা মনের রাণী, ছেলেও রাজা, মেয়েও রাণী। এমতাবস্থায় বাড়ি-ঘরগুলোতে কিভাবে শান্তি-স্বস্থি থাকতে পারে? এই প্রবৃত্তিপূজার জীবন, যাকে সকলেই অর্জন করার জন্য লোভাতুর–একটি অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়ে গেছে, যেখানে প্রতিটি বাড়ির লোকজনও জ্বলছে, প্রতিটি রাষ্ট্রের নাগরিকরা পুড়ছে এবং পৃথিবীর গোটা মানব বসতি সে অগ্নিকুণ্ডে ঝলসে যাচ্ছে।

প্রবৃত্তিপূজার জীবন বিপদের উৎস

পৃথিবীর বিপদের উৎস এটাই , আর এই বিপদ ও সংকটের সমাধান হলো, মনের বাসনা পূরণ করার পরিবর্তে আল্লাহর অনুসরণ করুন। কোটি মানুষ তো দূরের কথা, এই পৃথিবী মাত্র দু'জন মানুষেরও মনচাহি জীবন-যাপনের অবকাশ নিজের মধ্যে ধারণ করে না। এজন্যই মনচাহি জীবন-যাপনের ইচ্ছা ত্যাগ করুন এবং সেই ধারার জীবন-যাপনের চেষ্টা করুন, যার পয়গাম আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলেরা দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ আল্লাহর দাসত্ব ও খোদাপ্রেমের জীবন। এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা প্রতি যুগে এই জীবনের আহবানকারী পয়গাম্বরকে পাঠিয়েছেন। কেননা এই জীবনধারা অবলম্বন করেই পৃথিবী চলতে পারে।

নবী-রাসূলেরা পূর্ণ সাফল্য ব্যয় করে এই জীবনধারার দাওয়াত দিয়েছেন। প্রবৃত্তিপূজার তীব্রতা ভেঙ্গে চূর্ণ করতে সর্বাত্মক সাধনা ব্যয় করেছেন। কিন্তু শুরুতে আমি যেমন নিবেদন করেছি যে, তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে আত্মপূজা ও প্রবৃত্তিপূজার প্রচলন বন্ধ হয়নি। যখনই আল্লাহর গোলামীর আহবান কিছুটা শিথিল হয়েছে, তখনই প্রবৃত্তিপূজার প্রচলন বেড়ে গেছে। প্রবৃত্তিপূজার পাবনের তোড়ে পৃথিবীর সাধারণ লোকদের সমস্যা বেড়ে গেছে এবং চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

উদাহরণস্বরূপ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর সময়কালটা দেখুন। এই শতাব্দীতে রিপু ও প্রবৃত্তিপূজার জীবনের প্রচলন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল দেশে দেশে। এটা ছিল একটি প্রবাহমান নদী যার স্রোতে ছোট-বড় সবকিছু ভেসে যাচ্ছিল। রাজা-বাদশারা ছিল নিজ নিজ প্রবৃত্তির পূজায় লিপ্ত, প্রজা সাধারণও রাজা-বাদশাদের অনুকরণে লিপ্ত ছিল প্রবৃত্তিপূজায়। উদাহরণস্বরূপ ইরানের অবস্থা বর্ণনা করছি। সেখানকার প্রতিটি শ্রেণী প্রবৃত্তিপূজার ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল। ইরানের বাদশার প্রবৃত্তিপূজার অবস্থা এমন ছিল যে, তার স্ত্রীর সংখ্যা ছিল বার হাজার। এই মসিবত থেকে উদ্ধার করার লক্ষে মুসলমানগণ যখন দেশটিতে আক্রমন চালালেন এবং ইরানের বাদশা পালিয়ে গেল, সেই নাজুক মুহূর্তেও বাদশার সঙ্গে ছিল এক হাজার বাবুর্চি, এক হাজার গুণকীর্তনকারী এবং আরো এক হাজার ছিল বাজ ও শিকারী পাখির সংরক্ষক ও ব্যবস্থাপক। কিন্তু তারপরও বাদশার আক্ষেপ ছিল যে, নেহায়েত সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় তাকে বের হয়ে যেতে হয়েছে। সেই যুগের জেনারেল-সেনাপতিরা লাখ টাকার টুপি এবং লাখ টাকার মুকুট লাগাতো। উঁচুতে মামুলি ধরনের পোশাক পরা ছিল এক ধরনের অন্যায়। কিন্তু এই শ্রেণীর প্রবৃত্তিপূজা জনসাধারণকে কেমন দুর্ভোগে ফেলেছিল, এ বিষয়টির অনুমান আপনি এই তথ্য থেকে করতে পারেন যে, কৃষকের অবস্থা এমন করুণ হয়েছিল-তারা কর দিতে না পেরে ক্ষেত-খামার ত্যাগ করে খানকাহ আর ইবাদতখানায় এসে আশ্রয় নিত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা আমীর-উমারাদের প্রতিযোগিতার শিকারে পরিণত হয়ে দেওলিয়া হয়ে যেত। ফলে অর্থনৈতিক নৈরাজ্য ছিল সর্বত্র।

মোটকথা, জীবন সেখানে কী ছিল? একটি প্রতিযোগিতার ময়দান ছিল। জুলুম ও সীমাবদ্ধতা ব্যাপক ছিল। প্রত্যেক বড় তার ছোটকে, শাসক তার শাসিতকে লুণ্ঠন করা এবং তাদের রক্ত চোষার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। গোটা সমাজব্যবস্থায় এক হতাশা ছড়িয়ে পড়েছিল। আপনারা বুঝতে পারছেন-এমন সোসাইটিতে নৈতিকতা, বিশ্বাস ও চরিত্র কিভাবে গড়ে উঠতে পারে এবং আখেরাতের ভাবনা ও নৈতিক দায়িত্ববোধ কার থাকতে পারে? এ সমস্ত উন্নত বিষয় তো প্রবৃত্তিপূজার প্লাবনই ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এমন কেউ ছিল না, যিনি এই স্রোতের মুখে বাঁধ রচনা করবে এবং স্রোতকে রুখে দাঁড়াবে। জ্ঞানী, সাহিত্যিক ও দার্শনিক-সকলেই এ স্রোতের দিকে খড়কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছিল।

রাসূলুল্লাহ সা.-ই প্রবৃত্তিপূজার স্রোতকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন

কারো মাঝে সাহস ছিল না স্রোতের বিরুদ্ধে কদম ফেলে দেখাবে। স্রোতটি কিসের ছিল? পানির স্রোত নয়, সাধারণ রেওয়াজের স্রোত। সেই স্রোতের গতিরোধ করার সাহস করতে পারে একমাত্র কোনো সিংহহৃদয় ব্যক্তি। আল্লাহর মঞ্জুর ছিল, ওই স্রোতের গতি ঘুরে যাবে। এ কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা আরবে একজন মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে নবুওয়াত দান করেছেন। যাকে আমরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. নামে স্মরণ করি। তিনি প্রচলিত স্রোতের বিপরীতে শুধু কদমই রাখেননি বরং সেই স্রোতের গতিকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। সেই সময় এমন কোনো লোক দিয়ে কাজ হতো না, যে স্রোতের গতি পাল্টে দিতে না পারলেও সেই স্রোতে ভাসমান বস্তুকে উদ্ধার করতে পারে। কেননা তখন এমন কোনো সংরক্ষিত ও নিরাপদ জায়গা ছিল না, যেখানে সেই স্রোতের প্রবাহ বইছে না। ইবাদতখানা ও গীর্জাগুলোও এই প্লাবনের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল। এই সমুদ্রে কোথাও কোনো আশ্রয় দ্বীপ ছিল না। আর থাকলেও তা প্রতি মুহূর্তে ছিল আশঙ্কার মধ্যে। ঈমান, নৈতিক চরিত্র, ভদ্রতা, সংস্কৃতি এবং অল্পকথায় মানবতার প্রাণকে সেই পাবন থেকে বাঁচানোর কাজ যদি কেউ করতে সক্ষম হতেন, তাহলে কেবল সেই ব্যক্তিই সক্ষম হতেন, যার মধ্যে স্রোতের গতি ঘুরিয়ে দেয়ার সৎ সাহস রয়েছে। এমন ব্যক্তিত্ব তখন শুধুমাত্র আল্লাহর প্রেরিত সেই শেষনবী ছিলেন, যিনি গণ রেওয়াজের ওই স্রোতকে, যা এক ঝড়ের রূপে প্রবৃত্তিপূজার প্রচেষ্টায় খোদার দাসত্বের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ট শতাব্দীর পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা যে বিস্ময়কর বিপবের চিত্র এক নিঃশ্বাসে দেখতে পাই, যা সমস্ত জীবন এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র জগতকে

প্রভাবিত করেছে এবং এখনও মানবতা ও খোদার দাসত্বের যতটুকু পুঁজি অবশিষ্ট রয়েছে, এর সবই সেই মহান পয়গাম্বরের শ্রম ও মেহনতের সুষমামণ্ডিত ফসল। কবি বলেন, 'দুনিয়ায় এখন যে বসন্ত পল্লবিত, এরা সব চারা গাছ, তারই লাগানো ছিল।' অসম্ভব নয় যে, আপনাদের মধ্যে কারো এ সন্দেহ হতে পারে, এমন দাবী করা তো ঠিক নয় যে, সেই যুগে মানুষ সাধারণভাবে শুধু প্রবৃত্তিপূজারী ছিল। কেননা অন্য কিছু কিছু বস্তুর পূজারীও তো ছিল। কিছু লোক সূর্যপূজা করতো, কিছু লোক আগুনপূজা করতো, কিছু লোক ক্রুশের পূজা করতো, কিছু লোক গাছপূজা করতো এবং কিছু লোক করতো পাথরের পূজা। বিষয়গুলো স্ব স্ব স্থানে সঠিক। কিন্তু এই সমস্ত পূজা সেই এক পূজারই বিভিন্ন প্রকার যে, এগুলো প্রবৃত্তিপূজার পরিপন্থী ছিল না। এই সব পূজা পূজারীর মনচাহি জিন্দেগীতে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো না। আগুন, মাটি, পাথর, সূর্য ইত্যাদি কখনো তো পূজারীকে এ কথা বলতো না যে, তোমরা এই কাজ করো এবং এই কাজ থেকে বিরত থাক। এজন্য তারা এ সব বস্তুপূজার পাশাপাশি নিজের প্রবৃত্তির আনুগত্যও করতো। এ দুয়ের মাঝে তারা কোনো সংঘাত দেখতো না।

মোটকথা, আমাদের প্রিয়নবী সা. এই স্রোতের সঙ্গে লড়াই করার এবং এই স্রোতের গতিধারা পাল্টে দেয়ার দায় নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করলেন। এভাবে পুরো সোসাইটির সঙ্গে দ্বন্দ্ব কিনে নিলেন। অথচ তিনি তাঁর এই সোসাইটিতে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য এবং সকলের প্রিয়ভাজন ছিলেন। সাদীক, আমীন ইত্যাদি সম্মানজনক উপাধীতে তাঁকে ডাকা হতো। ব্যক্তিগত উন্নতি ও সম্মান লাভের বহু সুযোগ তাঁর ছিল। তাঁর সমাজে তাঁর এতই নির্ভরযোগ্যতা ও আস্থা ছিল যে, সম্মান ও উন্নতির এমন কোনো উঁচু স্তর ছিল না, যা তাঁর অর্জন হতো না। কিন্তু এসবই সম্ভব ছিল তখন, যখন তিনি তাদের জীবনধারাকে ভুল সাব্যস্ত না করতেন এবং তাদের জীবনের গতিকে অন্যদিকে প্রবাহিত করার ইচ্ছা ও সংকল্প ব্যক্ত না করতেন। কিন্তু তাকে তো আল্লাহ পাক দাঁড় করিয়েছেন এজন্য যে, পাবনের স্রোতে নিজেও যেন ভেসে না যান এবং অন্য কাউকেও ভেসে যেতে না দেন। এজন্য সর্বপ্রথম তিনি তাঁর জীবনকে আল্লাহর দাসত্বের উত্তম নমুনা বানিয়ে পেশ করেছেন। স্রোতের বিপরীতে নিজে কদম ফেলে দেখিয়েছেন, তারপর পুরো সোসাইটির গতি প্রবৃত্তিপূজা থেকে সরিয়ে খোদার দাসত্বের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছেন।

আল্লাহর দাসত্ব সৃষ্টির তিনটি মৌলিক বিষয়

এই প্রচেষ্টা সফল করার লক্ষ্যে তিনি মৌলিক তিনটি বিষয় মানুষের সামনে পেশ করলেন। এক. এই বিশ্বাস করো যে, তোমাদের এবং সমগ্র জগতের

সৃষ্টিকর্তা, আর এই জগতের ওপর কর্তৃত্ববান সত্তা এক। দুই. এই বিশ্বাস করো যে, এ জীবন শেষ হওয়ার পর অন্য আরেকটি জীবন আছে। সেই জীবনে এই জীবনের হিসাব-নিকাশ হবে। তিন. এই বিশ্বাস করো যে, আমি (মুহাম্মদ সা.) আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূল। তিনি জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। এই বিধি-বিধান মেনে আমাকেও চলতে হবে, তোমাদেরও চলতে হবে। তিনি যখন এইসব ঘোষণা করলেন, তখন তাঁর সমাজে হৈ চৈ পড়ে গেল। বিরুদ্ধবাদীরা উঠে দাঁড়াল। কারণ এই শ্লোগান তাদের জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী ছিল। সারা জীবন যে দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল, তা ছেড়ে দিয়ে অন্যমুখী হওয়া মূলত সহজ কোনো কাজ কাজ তো ছিল না। জীবনের কিশতি স্রোতের তালে তালে বয়ে যাচ্ছিল, কোনো কষ্ট ছিল না। তাদের কী আর দায় পড়েছে যে, স্রোতের বিপরীতে কিশতি চালিয়ে নানা দুর্ভোগ ও শঙ্কা তারা কিনে আনবে।

এজন্য তারা চেয়েছে, এই আওয়াজ যেন থেমে যায়। কিছু লোক নবী করীম সা. এর নিয়তের ওপরই সন্দেহ করে বসেছে। তাদের বুঝেই আসছিল না, তাদের মতোই দেখতে একজন মানুষ এমন প্রত্যয়ী কী করে হতে পারে যে, জীবনের এই ঝড়ো স্রোতের গতি সে পাল্টে দেয়ার চেষ্টা করেছে। তারা ভেবেছে, এই স্রোতে তো শুধু আমরাই নই, গোটা দুনিয়ার সকল জাতি, বিদ্বান ও প্রাজ্ঞ শ্রেণী, নেতা ও সাধু মহল–সবাই ভেসে চলেছে। এই স্রোতে ভেসে চলেছে শুকনো খড়কুটোর মতো সকল জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতি সরদারেরা, জাতিসমূহের বিশ্বাস ও নীতি-আদর্শ, তাদের প্রজ্ঞা ও দর্শন, সাহিত্য ও রাজনীতি। তারা এই দাবী ও দাওয়াতের ব্যাপারে কাউকে আন্তরিক মনে করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল। এজন্য তারা ভেবেছে অবশ্যই 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।' তারা মনে করেছে, হতে পারে এই উচ্চ আহবানের পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য ও খায়েশ কাজ করছে। এজন্য তারা একটি প্রতিনিধি দল রাসূলে কারীম সা. এর কাছে পাঠাল।

প্রতিনিধি দল তাদের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী তিনটি বড় বিষয় তাঁর সামনে উপস্থাপন করলো। তারা বলল, এ ধরনের কথাবার্তা দিয়ে আপনার উদ্দেশ্য যদি এই হয়ে থাকে যে, আমরা আপনাকে আমাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করি, তাহলে এ কথাবার্তা ত্যাগ করুন, আপনার নেতা হওয়ার ইচ্ছা আমরা মঞ্জুর করে নিলাম। অথবা অঢেল ধন-সম্পদের প্রত্যাশী যদি আপনি হন, তাহলে তা-ও আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। কিংবা আপনি যদি কোনো সুন্দরী নারীর প্রতি আকৃষ্ট হন, তাহলে আমরা সেই ইচ্ছাও পূরণ করব। দেশের সবচেয়ে সুন্দরী নারী আমরা আপনার সামনে পেশ করব। আপনি যেসব কথা উঠাতে

শুরু করেছেন, সেগুলো শুধু বন্ধ করুন। কিন্তু আল্লাহর এই সাচ্চা রাসূল এবং আল্লাহর দাসত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এই পতাকাবাহী চূড়ান্ত অমুখাপেক্ষিতার সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'আমি তোমাদের কাছ থেকে কিছু নিতে চাই না। আমি যা দিতে চাই, সেগুলো হলো এই তিনটি কথা, যেগুলোর প্রতি আমি তোমাদের আহবান করছি। আমি চাই মৃত্যু পরবর্তী জীবনে যেন তোমরা শান্তি পাও। আর সেটা আমার এই তিন কথার ওপর নির্ভরশীল।'

তাঁর কথাই শুধু নয়, তাঁর গোটা জীবনই সেই লোকদের এ ধারণাকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করেছে যে, তিনি পৃথিবীর কোন বস্তুর প্রতি আগ্রহী ছিলেন। শত্রুতা ও বিরোধিতা এমনই তীব্র রূপ ধারণ করেছিল যে, তাঁকে মক্কা ছেড়ে মদীনায় যেতে হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর দাসত্বের আহবান তিনি ছাড়েননি।

প্রবৃত্তিহীনতা ও খোদার দাসত্বের আশ্চর্য উদাহরণ

বিরুদ্ধবাদীদের কোনো ধারণাই ছিল না যে, প্রবৃত্তিপূজা থেকে তাঁর অবস্থান কত দূরে ছিল এবং প্রবৃত্তিপূজার এই স্রোতের বিপরীতে সাতরে যাওয়ার কী পরিমাণ শক্তি ও দৃঢ়তা তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি প্রবৃত্তিপূজা থেকে এতই দূরে ছিলেন যে, বাধ্য হয়ে মক্কা ছেড়ে চলে যাবার কিছুদিন পর যখন পুনরায় বিজয়ী বেশে মক্কায় ফিরে এলেন তখনও তাঁর খোদার দাসত্বমূলক চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বিজয়ের সামান্যতম উম্মাদনাও তাঁর ওপর চড়াও হতে পারেনি। বিজয়ী হয়ে মক্কায় প্রবেশের ধরণটি ছিল এমন যে, তিনি উটে চড়ে আসছিলেন, গায়ে ছিল গরীব মানুষের পোশাক এবং মুখে ছিল আল্লাহর শোকর, নিজের অক্ষমতা ও বিনয়ের প্রকাশ। এমতাবস্থায় মক্কার এক লোক সামনে পড়ে গেল এবং ভয়ে কাঁদতে শুরু করল। তিনি বললেন, 'ভয় পেয়ো না! আমি কুরাইশ গোত্রের সেই গরীব মহিলার ছেলে, যে শুকনো গোশত খেত।' একটু ভেবে দেখুন, কোনো বিজয়ী বীর এ ধরনের মুহূর্তে এমন কোনো কথা বলতে পারে, যার ফলে লোকদের অন্তর থেকে তার প্রতি ভীতি দূর হয়ে যাবে।

আপনারা বর্তমানেও দেখতে পাচ্ছেন এবং অতীতের অবস্থাও ইতিহাসে পড়ে দেখতে পারেন। যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এসে যায়, তারা পরিবার-পরিজন তার দ্বারা কী পরিমাণ লাভবান হয়, কী পরিমাণ সুবিধা ভোগ করে এবং কত রকম আরাম আয়েশ ও বিনোদন তাদের সামনে লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু খোদার দাসত্বের এই ঝাণ্ডাবাহীর অবস্থা এক্ষেত্রেও প্রচলিত পৃথিবী থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর আদরের কন্যা নিজের ঘরের সব কাজ নিজ হাতে করতেন, যার ফলে তার হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল এবং শরীরের পানির মশক বহনের চিহ্ন পড়ে গিয়েছিল। একদিন তিনি শুনতে পেলেন, যুদ্ধের ময়দান থেকে কিছু দাস-দাসী আব্বাজানের খেদমতে হাজির করা হয়েছে। তিনি ভাবলেন, আমিও এক

আধটা দাস অথবা দাসী চেয়ে নিয়ে আসবো। তিনি তাশরীফ নিয়ে গেলেন। নিজের দুর্ভোগের কথা জানালেন। হাতে কড়া পড়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখালেন। রাসূল সা. বললেন, 'আমি তোমাকে দাস-দাসীর চেয়েও উত্তম জিনিস দিচ্ছি। অন্য মুসলমানদের ভাগে দাস-দাসীকে যেতে দাও। ঘুমানোর সময় তেত্রিশ বার সুবহানালাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিলাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পড়ে নিও।' প্রবৃত্তিহীনতা ও খোদার দাসত্বের এ এক অদ্ভুত উদাহরণ, এ এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন আল্লাহর উপাসনাকারী এবং আল্লাহর দাসত্বকারীদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। এরপরও কি কেউ তাঁর প্রবৃত্তিহীনতার বিপক্ষে অক্ষর পেশ করতে পারে! অপরের পক্ষে এই উদারতা ও বদান্যতাকে এবং নিজের ও নিজের সন্তানদের ক্ষেত্রে এই নিঃস্বতা ও দারিদ্রকে প্রাধান্য দেওয়া মূলত পয়গাম্বরেরই বৈশিষ্ট্য।

বর্তমানে আপনাদের মধ্যে এমন লোক আছেন, যারা অতীতে কয়েক দিন অথবা কয়েক বছর জেল কেটেছেন। আজ ক্ষমতা লাভের পর সুদে আসলে সেই সব কষ্টের হিসাব উঠিয়ে নিচ্ছেন। যখন কোনো ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা এবং আইনের শাসন এসে যায়, তখন সে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তানদেরকে আইনের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু খোদার দাসত্ববাদীদের মহান নেতার অবস্থা এ ক্ষেত্রেও ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক মহিলার চুরির অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। তিনি হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। লোকজন রাসূল সা. এর নৈকট্যপ্রাপ্ত ও প্রিয় সাহাবীকে দিয়ে সুপারিশ করালেন যে, মহিলাকে ক্ষমা করে দেয়া হোক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, খোদার কসম! যদি মুহাম্মদ সা. এর কন্যা ফাতিমার দ্বারাও এমন অপরাধ ঘটে যায়, তাহলে মুহাম্মদ সা. তার হাতও কেটে ফেলবে।'

রাসূল সা. তাঁর বিদায় হজ্জ পালনকালে মুসলমানদের বিশাল সমাবেশে কিছু আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের ঘোষণা করেন। তখন সবার আগে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও নিজের পরিবারের ওপর সেইসব আইন-কানুন জারি করেন। তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন, আজ থেকে জাহিলিয়াতের সকল রীতি-নীতি বিলুপ্ত করা হলো। সুদী লেনদেন আজ থেকে বন্ধ এবং সবার আগে আমি আমার চাচা আব্বাস রা. এর সুদী ঋণকে বাতিল ঘোষণা করছি। এখন থেকে তার সুদ কারো ওপর আবশ্যকীয় নয়। তিনি আর সুদের পয়সা কারো নিকট থেকে উসূল করতে পারবেন না।

এটাই ছিল খোদার দাসত্ব। পক্ষান্তরে আজকের আইন-কানুন প্রণেতাগণ যদি এ ধরনের কোনো আইন তৈরির জন্য প্রস্তুত হতেন, তাহলে আগেই নিজের

আত্মীয়-স্বজন ও নিকটস্থ লোকদের জানিয়ে দিতেন যে, অমুক আইন আসছে। তাড়াতাড়ি নিজের চিন্তা করে নাও। জমিদারী বিলুপ্ত করার আইন পাশ হতে যাচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি জমিন ছুটাতে পার ছুটিয়ে নাও, বেচতে চাইলে বেচে দাও। এমনই মুহূর্তে তিনি ঘোষণা করেছেন 'ইসলামপূর্ব জাহেলি যুগের সকল রক্তের দাবী বাতিল করা হলো। এখন আর সেই সময়ের কোনো খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাবে না। এই আইনের অধীনে আমি সবার আগে রবীআ ইবনে হারেসের (আমার বংশের) রক্তের দাবী বাতিল ঘোষণা করছি।'
আমাদের প্রিয়নবী সা. উপমাহীন এই খোদার দাসত্ব নিয়ে (যার কয়েকটি উদাহরণ আমি দিয়েছি) প্রবৃত্তিপূজার প্লাবনের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, যে প্লাবন সকল জাতিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে তিনি এই পাবনকে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হন। লোকজন বাধ্য হয়ে তাঁর কথায় কান পাতে এবং তাঁর পয়গাম মেনে নেয়।

বিস্ময়কর বিপব

এভাবে যেসব ব্যক্তি নবীজির তিনটি মৌলিক বিষয়কে পুরোপুরি কবুল করে নিলেন, যা আল্লাহর দাসত্বপূর্ণ জীবনের মূল ভিত্তি, সে সব লক্ষ কোটি মানুষের জীবনের গতি এমনিভাবেই বদলে গেছে যে, বর্তমান পৃথিবীতে বিশ্বাস করাই দুরূহ হয়ে পড়ে, এমনও মানুষ হতে পারে! আমি উদাহরণস্বরূপ তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনের আলোচনা করব।
নবীজীর দাওয়াত গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একজন ছিলেন হযরত আবু বকর রা., যিনি নবী করীম সা. এর ওফাতের পর তাঁর প্রথম স্থলাভিষিক্ত ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম দায়িত্বশীল হয়েছিলেন। এই আবু বকর রা. এর প্রবৃত্তিহীনতার অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের সবচেয়ে উঁচু পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও জীবন এমনভাবে কাটাতেন যে, এর ফলে তাঁর পরিবারে লোকেরা মিষ্টি মুখ করতেও দ্বিধান্বিত হতেন। একদিন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, বাচ্চারা কিছু মিষ্টি খেতে চায়। তিনি উত্তরে বললেন, 'রাষ্ট্রীয় কোষাগার তো আমাদের মুখ মিষ্টি করার দায়িত্ব বহন করে না। তবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা হিসাবে যা কিছু পাই, যদি তা থেকে কিছু বাঁচাতে পার, বাঁচিয়ে নাও এবং কোন মিষ্টি জিনিস রান্না করো।' স্বামীর কথা মতে হযরত আবু বকর রা. এর স্ত্রী প্রতিদিনকার খরচ থেকে অল্প অল্প পয়সা জমিয়ে একদিন হযরত আবু বকর রা. এর হাতে তুলে দিলেন, যেন তিনি মিষ্টি রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে এনে দেন। তিনি সেই পয়সা নিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বশীলের কাছে চলে গেলেন এবং বললেন, 'এগুলো রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা হিসাবে আমি যা পাই তা থেকেই বাঁচানো পয়সা। এতে বুঝা গেল, আমাদের

প্রয়োজন এই পরিমাণ অর্থ ছাড়াও মিটে যায়, তাই এখন থেকে এই পরিমাণ অর্থ কমিয়ে আমার ভাতা দিবেন।'
দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক রা. এর খেলাফতের যুগে যখন মুসলমানগণ বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করলেন এবং ওমর রা. সেখানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গীরূপে একজন গোলাম ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় এই শাসকের কাছে সওয়ারী ছিল শুধু একটি। সেই সওয়ারীতে কিছু পথ তিনি সওয়ার হয়ে যেতেন এবং কিছু পথ গোলামকে সওয়ার বানিয়ে তিনি পায়ে হেঁটে চলতেন। যে সময় তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করছিলেন, সে সময় গোলাম ছিল সওয়ারীর উপর আর তিনি চলছিলেন পায়ে হেঁটে। তাঁর পরনের কাপড় ছিল জোরাতালি। তাঁর যুগেই একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তখন তিনি নিজের জন্য সেই খাবার খাওয়া জায়েজ মনে করতেন না, দুর্ভিক্ষের কারণে প্রজা-সাধারণের পক্ষে যা সহজলভ্য ছিল না।
হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রা. যিনি সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ ছিলেন এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সা. তাঁকে সম্মানসূচক খেতাব দিয়েছিলেন 'সাইফুল্লাহ' বা আল্লাহর তরবারী–তিনি এমনই প্রবৃত্তিমুক্ত ছিলেন এবং প্রবৃত্তিপূজা থেকে এ পরিমাণ স্বাধীন ছিলেন যে, একবার তাঁর একটি ভুলের কারণে একদম রণাঙ্গনে তাঁর কাছে তৎকালীন খলীফার পক্ষ থেকে অপসারণের চিঠি পৌঁছলে তাঁর কপালে সামান্য ভাঁজও পড়ল না। বরং তিনি বললেন, আমি যদি এ মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত ওমর রা. এর সন্তুষ্টি অর্জন কিংবা আমার সুনাম বাড়ানোর জন্য যুদ্ধ করে থাকি, তাহলে এখন আর যুদ্ধ করতাম না। কিন্তু যেহেতু আমি আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করে থাকি, তাই সেনাপতির পরিবর্তে একজন মামুলি সিপাহীর ভূমিকা নিয়েই আমি যথারীতি যুদ্ধ করে যাবো।' পক্ষান্তরে এ যুগের একটি তাজা দৃষ্টান্ত হলো জেনারেল মেক আর্থার। কোরিয়ায় যুদ্ধরত সৈন্যদের সেনাপতির পদ থেকে তাকে অপসারণ করার পর সে ভীষণ ক্ষুব্ধ হলো এবং প্রেসিডেন্ট ট্রুমেনের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে গেল।

আল্লাহর গোলামীমুখী সমাজ

শুধু এই কয়েকজন মানুষই নয় বরং তিনি পুরো জাতি ও সমাজকে এই নীতির ভিত্তিতেই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, সেটি আল্লাহর গোলামীমুখী একটি সমাজে পরিণত হয়ে যায়। তাঁর নীতি ছিল যদি কেউ কোনো পদমর্যাদার প্রার্থী বা এর প্রতি আগ্রহী হতো, তবে তিনি তাকে পদমর্যাদা দিতেন না। এমন সমাজে পদমর্যাদার প্রার্থী হওয়া, নিজের গুণকীর্তন গাওয়া এবং ক্ষমতার জন্য একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোনো অবকাশই ছিল না। যে মানবগোষ্ঠীর সামনে প্রতি মুহূর্তে এই আয়াত জীবন্ত থাকে 'সেই আখেরাতের আবাস আমি এমন

লোকদের জন্য নির্ধারিত করে দিব, যারা পৃথিবীতে কোনো উঁচুতা চায় না এবং বিপর্যয় ছড়িয়ে দিতে চায় না। আর শেষ পরিণতি আল্লাহভীরুদের জন্য'–যাদের সামনে এই বাস্তবতা জ্বলন্ত থাকে, কোনো ফেতনা-ফাসাদ ও দ্বন্দ্বের অপরাধে অপরাধী হওয়া কি তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল?

এটাই ছিল আল্লাহর গোলামীর আহবান, যা নবী করীম সা. দুনিয়ার সামনে পেশ করেছিলেন এবং পরিণতির দিক থেকে এটিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কল্যাণকর প্রয়াস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। কোনো ব্যক্তি পৃথিবীর অন্য কোনো দাওয়াত ও মিশনের নাম ধরে একথা বলতে পারবে না যে, তা পৃথিবীতে এই পরিমাণ কল্যাণ উপহার দিয়েছে। অথচ এই দাওয়াত ও মিশনের পক্ষে মানুষের এ পরিমাণ প্রচেষ্টা ও উপায়-উপকরণের প্রয়োগ হয়নি, যে পরিমাণ প্রয়োগ ঘটেছে আধুনিক যুগের কোনো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপবের পক্ষে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সকল বিপ্লব ও আন্দোলনের সম্মিলিত উপকারও সেই একটি মাত্র দাওয়াতের উপকার ও কল্যাণের এক দশমাংশও হতে পারবে না।

খোদার দাসত্বের ঝাণ্ডাবাহীরাই প্রবৃত্তিপূজার শিকার

এই পৃথিবী সেই দাওয়াতকে গ্রহণ করে নিলে আজও দুনিয়া থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবিচার এবং নৈতিক ত্রুটি বিদায় নিবে। কিন্তু অন্যদের সম্পর্কে কী বলব, যখন স্বয়ং এই মিশনের পতাকাবাহীরাই বর্তমানে প্রবৃত্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে গেছে। প্রবৃত্তিপূজা তো আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চুপ করে বসেছিল। সুযোগ পেয়েই সে খোদার দাসত্বের ঝাণ্ডাবাহীদের ওপর এক চোট প্রতিশোধ আদায় করে নিয়েছে। যে মুসলমানগণ প্রবৃত্তিপূজাকে পরাজিত করে দিয়েছিল এবং যাদের বিশ্লেষত্ব ছিল কুরআন মাজীদের এই ঘোষণা 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে কল্যাণের আদেশ দিবে এবং অকল্যাণ থেকে বিরত থাকবে'–আফসোস! তারাই এখন প্রবৃত্তিপূজার অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুর্ভোগ প্রবৃত্তিপূজা

আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুর্ভোগ হলো প্রবৃত্তিপূজা। পৃথিবীর বড় বড় লিডার এবং শান্তির পতাকাবাহী [ট্রুমেন, চার্চিল, স্টালিন] সবচেয়ে বড় প্রবৃত্তিপূজারী। এরা নিজেদের প্রবৃত্তিপূজা ও জাতীয় অহংবোধের মধ্য দিয়ে (যা প্রবৃত্তিপূজারই উন্নত ও বিকশিত রূপ) পৃথিবীকে ছাই বানিয়ে দিতে সদা প্রস্তুত। এটম বোমার চেয়েও ভয়ঙ্কর হচ্ছে প্রবৃত্তিপূজা, যা পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিয়েছে। লোকজন ক্রুদ্ধ হয় এটম বোমার ওপর। তারা বলে থাকে, 'এটম বোমা কিয়ামত ঘটিয়ে দিতে পারে।' আমি তো বলি, এটম বোমার অপরাধ কি? আসল অপরাধী তো এটম বোমার নির্মাতা। এর চেয়েও আগে অপরাধী হলো, সেই সব বিদ্যায়তন

ও সংস্কৃতি যেগুলো এই বোমাকে অস্তিত্বে এনেছে। আর এসব কিছুরই মূল হলো প্রবৃত্তিপূজা, যা এই সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে।

আমাদের দাওয়াত

আমাদের দাওয়াত, আমাদের আন্দোলন শুধু এটাই এবং এ লক্ষ্যেই যে, প্রবৃত্তিপূজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হোক। আল্লাহর গোলামীমুখী জীবনধারা ব্যাপক করা হোক। আমরা এই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই আপনাদের মুখোমুখি হয়েছি। আমরা জাতির প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষকে আহবান করি এবং তাদের সামনে আল্লাহর দাসত্বের শ্রেষ্ঠতম ঝাণ্ডাবাহী হযরত মুহাম্মদ সা. এর শিক্ষা, তাঁর জীবনচরিত এবং তাঁর সাথীবর্গের ঘটনাবলী উপস্থাপন করি, যারা ছিলেন দাসত্বের পথের সঠিক ও সত্য পথপ্রদর্শক। আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, তাদের দেখানো পথেই রয়েছে দুর্ভোগের সমাধান। আমাদের কাজ ও দাওয়াত একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ, যার ইচ্ছা হয়, তিনি এই গ্রন্থ পাঠ করে দেখুন।

যাদের নিয়ে গর্বিত মানব সভ্যতা

সবার জন্য জরুরী একটি বিষয়ের ওপর এখানে আলোকপাত করব। যা প্রত্যেকের স্বভাবগত, মানবিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, চারিত্রিক সর্বোপরি দীনের চাহিদা। এর দ্বারা আপনাদের অন্তরে খুলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা ও বিশ্বাস স্পষ্ট হবে। তাদের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পাবে। তাদের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত হবেন যে, তাঁরা আম্বিয়ায়ে কেরামের পর মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। তাদের জীবনের প্রতিটি ধাপ আমাদের জন্য অনুপম আদর্শ। তখন তাদের প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধ জাগবে। এর একটি প্রভাব পড়বে আপনার অন্তরে।

কৃতিত্বেই প্রশংসা

আমরা যদি কোনো ডাক্তারের প্রশংসা করি তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর মাধ্যমে অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করেছে। তিনি কিসের ডাক্তার যার হাতে একজনও আরোগ্য পায়নি। দু'চার জনের সমস্যাও দূর হয়নি। যদি কোনো শিক্ষক অথবা আলেমের প্রশংসা করা হয় তখন এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁর দ্বারা অনেক ছাত্র গঠন হয়েছে। তিনি শিক্ষা-দীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। অন্যথায় তার শিক্ষার কী দাম? তাঁর কৃতিত্বের পরিমাপকই বা কি? আবার যখন কোনো কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করা হয় তখন উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা উত্তম উপকরণ তৈরি করেন। আমি লক্ষ্ণৌর এক সমাবেশে বলেছিলাম, এখানকার কেউ যদি একথা বলে যে, আহমদ হোসাইন এবং দিলদার হোসাইনের কারখানা খুব ভাল। কিন্তু শুরুতে এখানে তৈরিকৃত জর্দার কৌটা খুব ভাল দেখেছিলাম, এখন আর ভাল দিচ্ছে না। তখন বিষয়টি এমন হবে যে, কারখানার মালিকেরা আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারবে। কারণ আপনি তাদের প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুন্ন করেছেন।

না জেনে মূল্যায়ন যথার্থ নয়

আমি মাদরাসার একজন খাদেম হিসেবে বলতে পারি শুধু হিন্দুস্তানেই নয়, বরং মুসলিম বিশ্বের একটি বিখ্যাত ও স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা। যদি এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কেউ একথা বলে যে, হযরত! প্রথম প্রথম নদওয়াতুল উলামা সুলায়মান নদভী, আব্দুস সালাম নদভী, আব্দুল বারী নদভী (রহ.) প্রমুখের মতো বিখ্যাতদের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সে রকম যোগ্য কেউ বেরোচ্ছে না। তখন এর খাদেম হিসেবে সর্বপ্রথম আমি তার প্রতিবাদ করব। নদওয়াতুল উলামার সাথে সংশিষ্ট সবাই এর জোরালো প্রতিবাদ জানাবে। ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আপনি বলুন, এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস সম্পর্কে কী জানেন? এর সন্তানদের সম্পর্কে কতটুকু জ্ঞাত? এর অবদান সম্পর্কে আপনার কী ধারণা আছে? তেমনিভাবে অনেক প্রতিষ্ঠান ও কারখানার নাম বলতে পারব। আতর আলী মুহাম্মদ আলী হিন্দুস্তানের একটি প্রসিদ্ধ আতর তৈরির প্রতিষ্ঠান। তাকে যদি বলা হয়, দু'চার মাস আপনার এখানে খুব ভাল আতর তৈরি হতো, কিন্তু পরে শিশিতে আতর নাকি তেল তা নিরূপণ করাও মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন কারখানার মালিকের অধিকার আছে এর প্রতিবাদ করার।

অন্যায় মন্তব্য

আমার এ সমস্ত উদাহরণ দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক প্রিয় রাসূল সা. সম্পর্কে যদি কেউ এ কথা বলে যে, যে সমস্ত লোক আপনার নৈকট্য লাভ করেছে, আপনার নাগালে ছিল, আপনার ছায়ায় জীবন কাটিয়েছে, আপনার অলৌকিক হাতের স্পর্শ পেয়ে যারা আদর্শ পুরুষ হয়েছেন; তাদের মধ্যে দু'চারজন দীনের পথে অবিচল থেকেছেন। বাকীরা সবাই দীন থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছেন।(নাউযুবিলাহ) রাসূল সা. এর ওপর এরচেয়ে মারাত্মক কোনো কথা হতে পারে না। শানে রেসালতে আঘাত করে এর চেয়ে শক্ত কথা আর হতে পারে না। বরং এর দ্বারা আল্লাহর শাশ্বত বিধানে ত্রুটি ধরা হয়।

সাহাবায়ে কেরাম-ই মানবতার শ্রেষ্ঠ সন্তান

আমি ইতিহাসের একজন ছাত্র হিসেবে বলতে পারি, মানব জাতির ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরাম সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। তাদের সম্পর্কে আপনাদের এই বিশ্বাস ও আস্থা রাখা জরুরী। আমার এই দাবির স্বপক্ষে অবস্থান নিতে আমি বিন্দুমাত্রও পিছপা হবো না। আমি ইতিহাসের কীট। ইতিহাসের গবেষক কিংবা বর্তমান সময়ের ইতিহাসবিদদের তালিকা প্রণয়ন করলে সবশেষে হলেও আমার নামটি থাকবে। আমার গবেষণা ও ইতিহাসের আলোকে দৃঢ়চিত্তে একথা বলতে পারব

যে, আদম আ. এর সৃষ্টি থেকে কেয়ামত পর্যন্ত নবীদের ব্যতীত সার্বিক দিক থেকে সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ মানব। মনুষ্যত্ববোধে, সঠিক পথের দিশাদানে, চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বে, পূঁত-পবিত্রতায়, অকৃত্রিমতায় কিংবা বরকত ও নিয়ামত প্রাপ্যের দিক থেকে সাহাবায়ে কেরাম রা. হতে অগ্রগামী কোনো মানুষ আজ পর্যন্ত জন্ম হয়নি। আর এমন হওয়াই বাঞ্চনীয়। প্রকৃতিগতভাবেই তা দরকারী। কেননা মানুষ যাকে অনুসরণ অনুকরণ করে তার দ্বারা সে প্রভাবিত হয়। তার মধ্যে কিছু থাকলেই সে দিকে বিমোহিত হয়। দীন এবং দুনিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে তা কার্যকর।

রাজনীতি, কবিতায়, শিক্ষায়, আইনে, চিকিৎসায়, লিখনিতে–সর্বক্ষেত্রেই অনুকরণীয় ব্যক্তি স্ব স্ব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা লাগে। তবেই তাকে অন্যরা অনুকরণ করেন। আদর্শ হিসেবে মেনে নেন। যিনি যে ক্ষেত্রে অনন্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী তার থেকে এই গুণ বিচ্যুরিত হবেই। এর দ্বারা অন্যরাও প্রভাবিত হবেন। অন্যথায় ওই ভাষা অকার্যকর যা বুঝে আসে না, ওই বাতি নিস্প্রভ যাতে আলো নেই, ওই সুগন্ধি নিষ্ফল যা মানুষকে আসক্ত করে না, ওই সূর্য নিস্প্রাণ যাতে রোদের ঝিলিক নেই, ওই চাঁদ খোলস মাত্র যাতে রৌশনি নেই, ওই বৃষ্টি অনর্থক যা বর্ষিত হয় না, যার দ্বারা কোনো ফসল উৎপন্ন হয় না, যাতে বাগান সজীব হয়ে ওঠে না।

একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ইমাম শাফী রহ. থেকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, ইহুদীদের কাছে প্রশ্ন করা হলো, হযরত মূসা আ. এর উম্মতে সর্বোত্তম কারা? তারা উত্তর দিলেন, যারা মূসা আ. এর স্পর্শে লালিত পালিত হয়েছেন। মূসা আ. কে যারা দেখেছেন, তাঁর সংস্পর্শ গ্রহণ করেছেন–তারাই উম্মতের শ্রেষ্ঠ লোক। খৃষ্টানদের কাছে জিজ্ঞেস করা হলো–হযরত ঈসা আ. এর অনুসারীদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম লোক কারা? তারা উত্তরে বললেন, ঈসা আ. এর হাওয়ারিয়ীন বা সাহায্যকারীরা। তেমনি শিয়াদের কাছে প্রশ্ন করা হলো উম্মতের মধ্যে (উম্মতে মুহাম্মদী) সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক কারা? তারা উত্তরে প্রথম সারির সাহাবায়ে কেরাম যেমন- খুলাফায়ে রাশেদীন (আলী রা. ব্যতীত), আশারায়ে মুবাশশারাহ ও বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের নাম উল্লেখ করলেন।

ভিত্তিহীন কথা

এটি একটি জঘন্য ও ভিত্তিহীন কথা। মানবপ্রকৃতির সাথেও এ কথার কোনো যোগসূত্রতা নেই। জ্ঞানী ও বিবেচকদের কাছে এ কথা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক নবীর

উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারাই যারা নবীদের কোমল স্পর্শে প্রশিক্ষিত, যারা নবীদের দর্শন লাভে ধন্য এবং যারা তাদের সরাসরি ফয়েজ ও বরকত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এ ক্ষেত্রে ইহুদী এবং খৃষ্টানদের উত্তর যথাযথ। নবীদের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের উত্তর এমন হওয়াই বাঞ্চনীয়। কিন্তু আমাদের ওই ভাইয়েরা যারা ঈমানদার হওয়ার বাহানা করেন তাদের উত্তর অপরিপক্ক ও অসংলগ্ন। এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান আছে বলে মনে হয় না। আজও তাদের কাছ থেকে এ ধরনের উত্তর পাওয়া যায়। আল্লাহ তাদের মুখ থেকে এ ধরনের কথা বের হওয়ার সুযোগ যেন না দেন। কারো যেন এ ধরনের প্রশ্ন করার প্রয়োজন না পড়ে। কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড ও লিখনি দ্বারা একথা প্রকাশ পায় যে, উম্মতে মুহাম্মদীর সবচেয়ে অপদার্থ, অথর্ব ও অসমর্থিত লোক হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম রা.। যারা নবী করীম সা. এর চোখ বন্ধ করার সাথে সাথে দীন থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছেন। (নাউযুবিল্লাহ)

তাদের এই দাবী কতটুকু সীমালঙ্ঘন তা ভাবতেও অবাক লাগে। কাদের বিরুদ্ধে তাদের এই বিষোদগার তা কি তারা কল্পনা করেছে? যারা নবীর সংস্পর্শ লাভে ধন্য হয়েছেন, স্বয়ং নবুওয়াতের ধারক যাদের প্রশিক্ষক, আল্লাহর বাণী যারা সরাসরি নবীর পবিত্র মুখ থেকে শুনেছেন এবং এর প্রসারের দায়িত্বপ্রাপ্ত। যাদের আচার-ব্যবহার, কাজ-কর্ম নবীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, স্বয়ং নবী যাদের হিসাবপত্র নিয়েছেন; তারাই কি না অপদার্থ, অথৈব! এর চেয়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন কথা আর কী হতে পারে? এই গাজাখুরী কথা শুধু উম্মতে মুহাম্মদী নয় অন্যান্য নবীর উম্মতেরাও কখনো সমর্থন করবে না।

একটি রূপক ঘটনা

বেশ কয়েক বার আমার লন্ডনে ও আমেরিকা যাবার সুযোগ হয়েছে। একাধিকবার এ কথা বলেছি যে, ওয়াশিংটন ডিসির ইসলামিক সেন্টারে অথবা লন্ডনের হাইটস পার্কে যদি আমি ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকি। আমরা জোরালো বক্তব্যে যদি সবাই বিমোহিত হয়ে যায়। বক্তব্যের প্রভাবে অবস্থা যদি এই হয় যে, লোকেরা ইসলাম গ্রহণের জন্য দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে 'আমাকে তওবা করান এবং ইসলামে দাখিল করুন'–এমতাবস্থায় যদি কোনো লোক দাঁড়িয়ে বলতে থাকে, আপনি ঠিক বলেছেন, কিন্তু এতে আমরা আপনার ওপর কী ভরসা রাখতে পারি আর আপনিই বা আমাদের ওপর কী আশা করতে পারেন? কারণ আমরা ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামে স্থির থাকব এর কী গ্যারান্টি রয়েছে? যে সমস্ত লোক স্বয়ং আল্লাহর রাসূলের হাত ধরে মুসলমান হয়েছিল এবং তাঁর ছায়ায় একদিন দু'দিন নয় দীর্ঘ তেইশ বছর কাটিয়েছেন, তারাই তো রাসূলের চোখ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে

পড়েন–এমতাবস্থায় আপনি আমাদের ওপর কিভাবে আস্থা রাখতে পারেন? তাদের এই কথার কোনো জবাব নেই। দুনিয়ার কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এর কোনো জবাব দিতে পারবে না। এটি একটি বিদ্বেষপ্রসূত ও বিবেক বিবর্জিত কথা যার জবাব দেয়া থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

সাহাবায়ে কেরাম রা. সরাসরি নবী করীম সা. এর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের সার্টিফিকেট স্বয়ং আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন 'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন তাদের অন্তরে কী ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (ফাতাহ-১৯) আল্লাহ যাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন তারাই নাকি নবী করীম সা. ইন্তেকাল করার সাথে সাথে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছেন! কী আশ্চর্য কথা! অবাস্তব ও মিথ্যার বেসাতি আর কি পর্যায় হতে পারে?

গুণ ও আদর্শের বিভা সাহাবায়ে কেরাম

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে জানুন, তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখুন। তাদের প্রকৃত স্তর নিরূপণের ভার আপনাদের বিবেকের ওপর ছেড়ে দেয়া হলো। তারা ছিলেন দীনের একনিষ্ঠ ধারক। নিজেদের বিলীন করে দিয়েছিলেন দীনের পথে। তাদের বিশ্বাস, আমল, আখলাক, লেনদেন, রীতি-নীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রপরিচালনা পদ্ধতি তথা জীবনের প্রত্যেকটি দিক ছিল পূর্ণ শরীয়াত অনুযায়ী। আল্লাহ তাআলা খাজা আলতাফ হোসাইন হালিকে উঁচু মাকাম দান করুক। তিনি সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সম্পর্কে কতই না সুন্দর বলেছেন 'কেবল সত্য-ন্যায়ের পথেই ছিল তাদের পদচারণা, সত্যের সাথেই ছিল তাদের নিবিড় সম্পর্ক, নিজের থেকে বিচ্ছুরিত হয়নি কোনো জ্যোতি, শরীয়াতের কব্জায় ছিল এর নিয়ন্ত্রণভার। শরীয়াতের নির্দেশে যেখানে নরম হওয়ার নরম হতেন, যেখানে গরম হওয়ার গরম হতেন।' সাহাবায়ে কেরাম শুধু আকায়েদ ও ইবাদাতেই মুসলমান ছিলেন না, লেনদেন ও চরিত্রেও ছিলেন পূর্ণ মুসলমান। রীতি-নীতি, প্রথায়-প্রকৃতিতেও তারা ছিলেন পূর্ণ মুমিন।

বর্তমান মুসলমানদের নাজুক হালত

আজ আমাদের মুসলমানদের অবস্থা কি! কিছু লোক যারা বিশ্বাসগত মুসলমান আলহামদুলিল্লাহ তাওহীদের ব্যাপারে তাদের ধারণা স্বচ্ছ, রিসালাত ও ইসলামী মূলনীতিতেও তাদের অবস্থান সঠিক, কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা খুবই ক্ষীণ। আবার কেউ আছেন যাদের আকায়েদ ও ইবাদাত সঠিক কিন্তু লেনদেন ও চরিত্রে স্বচ্ছ নয়, তাদের চরিত্রে মাধুর্যতা ও সৌন্দর্যের অভাব,

লেনদেনের ক্ষেত্রে অপরিষ্কার। খেয়ানত করেন, মাপে কম দেন, যৌথ মালে অনধিকার চর্চা করেন, প্রতিবেশি তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ। হাদীসে এসেছে, 'প্রকৃত মুসলমান ওই ব্যক্তি যার হাত ও মুখ দ্বারা অন্য মুসলমান নিরাপদ।' অন্য হাদীসে আছে, তোমাদের মধ্যে কেউ ওই পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তার অত্যাচার থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ না থাকবে।

একমাত্র আদর্শ সাহাবায়ে কেরাম

মুসলমানদের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণী দীনকে শুধু আকায়েদ ও ইবাদাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছে। আখলাক ও মুয়ামালাত থেকে দীনকে বিদায় করেছে। তাদের চরিত্র অসুন্দর, লেনদেনে তারা খুবই অস্বচ্ছ। তারা বান্দার হক নষ্ট করেন, অন্যের অনিষ্ট সাধন করেন। জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ইসলাম তাদের থেকে উপেক্ষিত। সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা এরূপ ছিল না। তাদের কাছে আকীদা থেকে মুয়ামালাত পর্যন্ত সবই সমান গুরুত্ব পেত। সমানভাবে পালন করতো সবকটি। তারা ছিলেন সঠিক পথের দিশারী। তারা ছিলেন সত্যের মাপকাঠি। তাদের একটি কাজও শরীয়াতের সীমানার বাইরে হতো না। চিন্তার বিষয় হচ্ছে, নবী করীম সা. তের বছর মক্কা এবং দশ বছর মদীনায় কাটিয়েছেন; কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে এ পরিমাণ লোক ইসলাম গ্রহণ করেননি যা হুদায়বিয়ার সন্ধি থেকে মক্কা বিজয়ের দুই বছরের মধ্যে করেছেন। বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবনে শিহাব জুহরী রহ. যিনি কয়েক লাখ হাদীসের সংকলক, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধি থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত দু'বছরে যে পরিমাণ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে তা বিশ বছরেও করেনি। এর কী কারণ? এর কারণ হচ্ছে, সন্ধির পূর্বে যুদ্ধ ও ভয়-ভীতির একটি অদৃশ্য দেয়াল ছিল। সন্ধির কারণে তা দূর হয়ে যায়। শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা আসে। ফলে নির্বিঘ্নে ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকেন, একজন অন্যজনকে টেনে আনেন। যারা যখন খুশি ইসলাম গ্রহণ করতে পারলেন। তারা যখন মদীনায় আসলেন তখন দেখতে পেলেন এটি এক ভিন্ন জগত। শান্তিনিবিড় এক সমাজব্যবস্থা! মিথ্যা, ধোঁকা, গালি-গালাজ, রাগ-ক্রোধ, হিংসা-বিদ্বেষের কোনো চিহ্নও নেই এখানে। অন্যের অধিকার বিনষ্টের কোনো চর্চা হয় না। নফস ও প্রবৃত্তির পূজা করা হয় না। আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। সবাই কামনা ও লোভমুক্ত। পূত-নিখূত এক ভিন্ন জগত। ধন-সম্পদ রাস্তায় পড়ে থাকলেও কুড়িয়ে নেয়ার কেউ নেই। ছেলে-বুড়ো সবাই এক আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত। অদৃশ্য এক শক্তি যেন তাদের বিরত রেখেছে অনৈতিক সব কাজ থেকে। মুহাজিরদের সাহায্যে তারা আত্মত্যাগে প্রস্তুত। নিজের বাচ্চাদের উপোস রেখে মুহাজিরদের খেতে দিচ্ছেন।

হযরত আবু তালহার ঘটনা

হযরত আবু তালহা রা. এর ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে আল কুরআনে বলা হয়েছে 'এবং তারা (মুহাজিরদের) নিজের জান থেকেও প্রাধান্য দেয়। নিজেদের শত প্রয়োজন থাকার পরও।' রাসূল সা. এর দরবারে মেহমান আসল। রাসূল সা. ঘোষণা করলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে, মেহমানকে তার ঘরে নিয়ে খাওয়াবে? আবু তালহা আনসারী রা. সাড়া দিলেন। মেহমানকে ঘরে নিয়ে গেলেন। বিবিকে বললেন, আল্লাহর রাসূলের মেহমান নিয়ে এসেছি। ঘরে কিছু আছে কি? বিবি জানালো, যে খাদ্য আছে তা বাচ্চারা এখন খাবে। আবু তালহা রা. বললেন, বাচ্চাদেরকে খানা থেকে বিরত রাখ। মেহমানদের সামনে যখন খানা পরিবেশন করা হবে তখন কোনো বাহানায় বাতি নিভিয়ে দিবে। তাই করা হলো। অন্ধকারে আবু তালহা রা. তাদের সাথে খাওয়ার অভিনয় করলেন, কিন্তু খেলেন না। মেহমানদের বুঝালেন তিনি খাচ্ছেন। এভাবে নিজের বাচ্চাদের উপোস রেখে মেহমানদের খাওয়ালেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রশংসা করে উপরোল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। এই হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের আত্মত্যাগের নমুনা! তিতিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর।' কিছু করবে, কিছু ছাড়বে, এক হাত এগুলে দু'হাত পিছিয়ে থাকবে, একটি পালন করে অন্যটি বর্জন করবে–এটি ইসলামের পথ নয়। এর কোনো সার্থকতা নেই, একটি ধোঁকা মাত্র। আল্লাহ তাআলা চান, ইসলাম বলে, তুমি পরিপূর্ণ মুসলমান হও। দীনের একজন দাঈ হিসেবে বলছি, বর্তমানে আমাদের আচার-ব্যবহার, বিয়ে-শাদী, কাজ-কর্ম, লেনদেন–কোনোটিই ইসলামসম্মত হচ্ছে না। প্রকৃত দীন থেকে দূরে বহু দূরে। আমরা আজ মনগড়া তরীকাকে দীন বানিয়ে নিয়েছি। অথচ দেখুন, সাহাবায়ে কেরামের জীবন কেমন ছিল! কী ছিল তাদের আদর্শ! কতই না সুন্দর ছিল তাদের কর্মকাণ্ড! যার দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি উপরের ঘটনা দ্বারাই। সাহাবায়ে কেরামের সেই আদর্শ আজ আমরা ছেড়ে দিয়েছি।

মুসলমানদের সংশোধন প্রয়োজন

তাদের বিশ্বাস, কাজ, আলোচনা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। তাদের জীবনকে আমাদের আদর্শ করতে হবে। শুধু মুখে মুখে তাদের প্রশংসা, তাদের কীর্তি আলোচনা করা, তাদের স্মরণে সমবেত হওয়া, আর আমলের ক্ষেত্রে এদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা প্রকৃত ভালোবাসার দাবী নয়। বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে আজ তাদের আদর্শকে উপেক্ষা করা হচ্ছে নির্মমভাবে। অভিশপ্ত যৌতুকের কুপ্রথা আজ চালু হয়ে গেছে মুসলমানদের ভেতরেও। আমি নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ি। মুসলমানদের ভেতরকার কুসংস্কার ও কুপ্রথাসমূহ দেখে আমার ভয় হয়, আল্লাহর শাস্তি না জানি কখন নাজিল হয়ে যায়। যৌতুকের কারণে আজ বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনাও ঘটছে। যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে নির্যাতনের খবরও পাওয়া যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের হিদায়াত দিন। এ ধরনের জঘন্য পাপ থেকে মুক্তি পেতে সমাজের নেতৃস্থানীয়দের শুভবুদ্ধির উদয় করে দিন। এসবই অতিরিক্ত দুনিয়াপূজারী হওয়ার কারণে ঘটেছে। হাদীসে বলা হয়েছে, 'দুনিয়ার ভালোবাসা প্রত্যেক গোনাহের মূল।' আজ আমরা এই ব্যাধিতে আক্রান্ত।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে জানতে হবে

প্রত্যেক মুসলমানের উচিত হলো, সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ভালভাবে জানা, বুঝা এবং তাদের প্রতি স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করা। একজন মুমিন হিসেবে একথা বদ্ধমূল রাখতে হবে যে, আদম আ. এর সময় থেকে এ পর্যন্ত নবীগণ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ তাদের সমপর্যায়ের হতে পারেননি, আর কখনো পারবেও না। দ্বিতীয়ত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তাদেরকে অনুসরণ-অনুকরণের চেষ্টা করুন। আকায়েদ, ইবাদাত, আচার-অনুষ্ঠান, মেলামেশা তথা জীবনের পদে পদে তাদেরকে আদর্শ হিসেবে দেখুন। কুরআন-হাদীসের ওপর নিজেরা আমল করুন, অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করুন। সাহাবাদের আদর্শ কতই না অনুপম ছিল! তাদের ঘরে যখন কোনো জিনিস প্রস্তুত হতো তখন তা প্রতিবেশির ঘরে পৌঁছে দিতেন। তারা দিতেন তাদের প্রতিবেশিকে। এভাবে পুনরায় তা প্রথম ঘরে ফিরে আসতো। এর চেয়েও আত্মোৎস্বর্গের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যুদ্ধের ময়দানে। প্রচণ্ড গরম, তুমুল যুদ্ধ চলছে। আঘাত পেয়ে পড়ে আছেন অনেকেই। পানির জন্য অন্তর চৌচির হয়ে আছে। এমন সময় কেউ একজন এক গ্লাস পানি দিলেন। তিনি বললেন, আমি এখনও আওয়াজ শুনতে পারছি। আমার পাশের ভাইয়ের অবস্থা এর চেয়েও খারাপ। পানিটুকু তাকে দিন। দ্বিতীয়জনের কাছে গেলেও একই উত্তর। এভাবে কয়েকজনের কাছে ঘুরে আবার প্রথমজনের কাছে ফিরে আসে পানি। কিন্তু ততক্ষণে তিনি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে চলে গেছেন। একে একে সবারই এই অবস্থা হয়। অপর ভাইয়ের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে পানি না খেয়ে সবাই শাহাদাত বরণ করেন। আত্মত্যাগের এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোথাও আছে কি!

নিজেদের জীবন বিশ্লেষণ প্রয়োজন

এসবই আমাদের জন্য অনুসরণীয়। বরং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। জীবনকে সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর করুন। বিয়ে-শাদী, আচার-অনুষ্ঠানে এতদ অঞ্চলে যে সমস্ত কুপ্রথা ও কুসংস্কার চলছে এর থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখুন। ইসলামী

রীতি-নীতি প্রয়োগ করুন সর্বক্ষেত্রে। অপচয় ও অপব্যয় থেকে বাঁচুন। নিজেকে প্রকাশ করার চিন্তা অন্তর থেকে মুছে ফেলুন। মুসলমানের আদর্শ তো হওয়া উচিত সাহাবায়ে কেরামের সেই আদর্শ যে আদর্শ দেখে বিমোহিত হয় অমুসলিমরা পর্যন্ত। কোনো অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে একজন মুসলমান থাকলেও যেন এর প্রভাব পড়ে আশেপাশে। তারা যেন আস্থা রাখতে পারে আপনার ওপর, ইসলামী ব্যবস্থার ওপর। তারা যেন দৃঢ়তার সঙ্গে একথা বলতে পারে যে, এখানে কোনো অনৈতিক কাজ হবে না। চুরি, ডাকাতি হবে না। অন্যায়-অনাচার হবে না। এখানের নারী-পুরুষরা নিরাপদ। কারণ এখানে মুসলমান আছেন। ইসলামের আদর্শ এখানে আছে। আপনারা এই ধারা চালু করুন। এভাবেই বিস্তার ঘটবে ইসলামের। সাহাবায়ে কেরামের প্রকৃত উত্তরাধিকার দাবি করা তখনই হবে সার্থক। আল্লাহর দরবারেও তখন গণ্য হবে বিশেষ মর্যাদায়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দিন সাহাবায়ে কেরামের পথ অনুসরণ করার। সর্বক্ষেত্রে তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার। তাদের সম্পর্কে বেয়াদবীমূলক মন্তব্য থেকে বেঁচে থাকার। আমীন।

নয়া ঈমানের পয়গাম

দীনের জন্য আপনাদের এই উপস্থিতি দেখে আমার বড়ই খুশি লাগে। আমার মন চায় শুধু আল্লাহর শোকার আদায় করতে যে, আপনারা আপনাদের কাজ-কাম ফেলে রেখে দীনের ডাকে সাড়া দিয়ে এখানে তাশরীফ নিয়ে এসেছেন। সবচেয়ে বড় ইহসান হলো, ঈমানের দাওয়াতে আজও দূর-দুরান্ত থেকে লোকদের এনে জড়ো করা যায়। কামনা করি ঈমানের শক্তি যেন এর চেয়েও বৃদ্ধি পায় এবং আমাদের মধ্যে যেন নতুনভাবে ঈমানী জিন্দেগী জন্ম নেয়।

দীন ও ঈমানের পার্থক্য

একটি হলো দীন, আর অন্যটি হলো ঈমান। উভয়টির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। দীন তো হলো ওই নেজাম যার পয়গাম নিয়ে আগমন করেছেন সকল নবী-রাসূল। যার সর্বশেষ পয়গাম নিয়ে আগমন করেছেন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.। আর আল্লাহ তাআলা তাঁরই মাধ্যমে দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম, আর মনোনীত করলাম তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে।' (মায়েদা)

দীন তো নিঃসন্দেহে পূর্ণতা পেয়েছে, এখন এতে যে কেউই কোনো কিছু বাড়াতে-কমাতে চায় সে দাজ্জাল ও মিথ্যুক বলে পরিগণিত হবে। তবে আরেকটি বিষয় হচ্ছে এ দীনের ওপর ঈমান আনা এবং এ দীনের হাকিকত সম্পর্কে জানা। দীনের ওপর নিঃসন্দেহে মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে–এতে কোনো জিনিস বাড়ানোর দাওয়াত দেয়া যাবে না, তেমনি এর থেকে যেমন কোনো জিনিস কমানো যাবে না। কিন্তু ঈমানের বিষয়টি এরূপ নয়। এতে উন্নতির অবকাশ রয়েছে বিস্তর। এজন্য ঈমানের সজীবতা ও বৃদ্ধির দাওয়াত কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। বরং অনিবার্য প্রয়োজন হলো দীনের ওপর

নিজের ঈমান ও বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে গ্রহণ করা, এর জন্য নিজের সর্বস্ব কুরবানী করে দেয়া এবং যেকোনো জিনিসের বিনিময়েও এটাকে নিজের হাতছাড়া না করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। এই উম্মতের প্রতিটি প্রজন্ম ও সম্প্রদায়কে প্রতি যুগে এ দীনের ওপর নতুন ঈমান আনা এবং শুরু থেকে দীনকে বুঝা অতীব জরুরী।

দেখা ও অভিজ্ঞতার চেয়েও বেশি দরকার নবীর পয়গামের ওপর বিশ্বাস

নবী করীম সা. এর আগমনের সময়ও দীনের কিছু কিছু বিষয় বিদ্যমান ছিল। নামায, হজ্জ ইত্যাদি কোথাও কোনোভাবে অস্তিত্ব ছিল। দীনের অস্তিত্ব তখনও একদম বিলীন হয়ে যায়নি। প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস এবং আসমানী দীনের অনেক অবয়ব ও চিহ্ন তখনও মজুদ ছিল। কিন্তু যে জিনিসটা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তা হলো-দীনের মধ্যে কোনো শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। এ সময়ের লোকদের এই বিশ্বাস তো ছিল-সাপের বিষ জীবন বিনাশ করে দেয়, বাতাস জীবনের জন্য অপরিহার্য, খাদ্যে পেট ভরে। এমনিভাবে জীবনের অভিজ্ঞতাজাত অনেক বাস্তবতার প্রতি তাদের আন্তরিক বিশ্বাস ছিল। কিন্তু বিশ্বাস ছিল না একথার ওপর-দোযখের আগুন কত ভয়াবহ ও দুর্বিষহ। আর জান্নাতের সুখ-শান্তি কত অনুপম ও অনাবিল। একথার ওপর বিশ্বাস ছিল না যে, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে দুনিয়াতেও সাফল্য লাভ করা যায় না। অথচ তাদেরই চাকর-বাকরাই যখন তাদের প্রতি অবাধ্যতা পোষণ করত তখন তাদের ঘরে ঠাঁই পেতো না। তারা বিশ্বাস করতো না গোনাহ ও নাফরমানি দ্বারা জনবসতি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তারা একজন চিকিৎসকের কথার ওপর যতটা আস্থা রাখত একজন নবীর কথায় ততটা বিশ্বাস রাখত না। এর কারণ হলো দীনের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাদের দীন সজীবতা হারিয়ে পরিণত হয়েছিল জড়পদার্থে। এ জন্য এদিকে তাদের কোনো আগ্রহই ছিল না। শুধু পার্থিব জীবন এবং তাদের দেখাশোনা অভিজ্ঞতার ছায়াগুলো প্রচণ্ড বাস্তবতা হয়ে তাদেরকে ঢেকে রাখত।

আমাদের বর্তমান অবস্থাও প্রায় এই দাঁড়িয়েছে। এখন যদি কেউ এসে ঘোষণা করে 'চিড়িয়াখানা থেকে একটি বাঘ ছুটে গেছে' তাহলে আপনি দেখবেন এই সমাবেশের সকলের দৃষ্টি সে দিকে নিবদ্ধ হবে। সবাই নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে যাবে। এ সমাবেশের প্রশান্ত মাহফিল বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত হয়ে পড়বে। কারণ আমাদের জীবনের মমতা আমাদের ওপর সওয়ার হয়ে আছে। যখন কোনো আশঙ্কা আমাদের জীবনকে চ্যালেঞ্জ করে বসে তখন আমাদের শক্তিগুলো সতেজ হয়ে ওঠে এবং জীবন বাঁচাতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি ওই জীবনের আশঙ্কার কথা বলেন, যে জীবনের কোনো শেষ নেই, যেখানে শান্তি

ও আরাম উভয়টি অনন্তকালের, দেখা যাবে আমরা অত্যন্ত নিস্পৃহতার সঙ্গে সে সংবাদ শুনব, এর প্রতি দৃষ্টিপাত করা বা ভাবার প্রয়োজন বোধ করব না। এর কারণ দীনহীনতা নয়, বরং দীনের ওপর ঈমানের দুর্বলতা ও কমতি। তবে এটা এক ধরনের বিশ্বাসহীনতাও। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ঈমানের এই দুর্বলতা সত্ত্বেও ওই জীবনের প্রতি কিভাবে আসক্তি সৃষ্টি হবে যে জীবন আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যে জীবন আমাদের স্থূল দৃষ্টির আড়ালে।

সাফা পর্বতে দাওয়াতের সূচনা

রাসূল আকরাম সা.কে যখন আল্লাহ তাআলা তার রাসূল হিসেবে মনোনীত করলেন তখন আরবে একটি রেওয়াজ ছিল-যদি কোনো গোত্র অন্য কোনো গোত্রের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিত আর আগন্তুক গোত্রের কোনো সদস্য আক্রমণকারী গোত্রকে দেখে ফেলত, তখন সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তি পাহাড়ের চূড়ায় চড়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে শত্রুর আগমনের খবর দিত। ওই ব্যক্তিকে আরবরা 'নাঙ্গা সতর্ককারী' বা স্পষ্ট ভীতিপ্রদর্শনকারী বলে আখ্যায়িত করত। তার এ আচরণ এটা প্রমাণ করত যে, শত্রু একদম মাথার উপরে এসে পৌঁছে গেছে। যে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থাতেই যেন প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

আরবের এই চিরায়ত প্রথা মোতাবেক একদিন নবী করীম সা. একটি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহন করলেন। তবে তিনি কাপড় খুলেননি, কাপড় পরেই ঘোষণা করলেন 'আনান নাযিরুল উরয়ান' (আমি স্পষ্ট ভীতিপ্রদর্শক।) রাসূল সা. এর সত্যবাদিতা মক্কাবাসীর কাছে স্বীকৃত ছিল। এজন্য সারা শহরের লোকজন কামকাজ ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে এসে জড়ো হলো। তারা এ ডাকে এত স্বতস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়ার কারণ ছিল তারা ধারণা করেছিল রাসূল সা. এর এই আহবান নিশ্চিত কোনো শত্রুর আগমনের সংবাদ। তারা সমবেত হওয়ার পর রাসূল সা. তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে বলি পাহাড়ের পেছনে শত্রুবাহিনী লুকিয়ে আছে, একদম তোমাদের কাছে চলে এসেছে-তাহলে কি তোমরা আমার এ সংবাদকে সত্য মনে করবে? অথচ তোমরা সরাসরি শত্রুবাহিনী দেখতে পারছ না। যেহেতু আমি চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছি এজন্য সরাসরি দেখছি, কারণ আমার আর তাদের মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক নেই। উপস্থিত সবাই এক বাক্যে বলল, নিঃসন্দেহে আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করব।

কিন্তু যখন রাসূল সা. বললেন, ওই বাহিনী আল্লাহর আযাবের বাহিনী, যারা একদম মাথার উপরে দাঁড়িয়ে আছে, আমার কথা মান্য কর তবে তোমরা এদের হামলা থেকে বাঁচতে পারবে-তখন তাদের সব মনোযোগ ও সমস্ত আশঙ্কা কেটে গেল। তারা এসে জানতে চাইল তবে কি তুমি আমাদেরকে এজন্যই এখানে জড়ো করেছ? এটা কি কোনো কথা হলো? তাদের এ

আচরণের মূল কারণ হলো তারা ছিল দুনিয়ার জীবনের মোহে অন্ধ। দুনিয়ার যেকোনো আশঙ্কা তাদেরকে অস্থির ও বিচলিত করত। অথচ পরকালের কোনো ভাবনাই তাদের মধ্যে ছিল না। এজন্য পরকালের আশঙ্কার কথা শুনেও তাদের মধ্যে কোনো চিন্তা আসল না।

রাসূল সা. এর যুগে বিভিন্ন ধর্ম বিদ্যমান ছিল। তারা সবাই ঈমানের দাবীদারও ছিল। কিন্তু তাদের ঈমান ও বিশ্বাস এত ঠুনকো ও দুর্বল ছিল যে, নিছক কল্পনাপ্রসূত অসার কার্যক্রম ও কুসংস্কারের পর্যন্ত মোকাবিলা করতে পারতো না। তাদের পছন্দের অন্যায় কাজ ও বদ আখলাক থেকে বিরত রাখতে পারতো না। তাদের কাছে দীন তো মজুদ ছিল কিন্তু ঈমানী শক্তি ও এর সজীবতা নির্জীব হয়ে যাওয়ায় ওই দীন ছোট ছোট মসিবত মোকাবিলা করার জন্যও তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারত না। কিন্তু রাসূল সা. এর আনিত সত্য দীনের ওপর ঈমান গ্রহণকারীদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ এর বিপরীত। তারা পার্থিব জগতের চেয়ে পরজগতের প্রতি অধিক আসক্ত ছিলেন। পরকালের ভাবনা তাদের মধ্যে সর্বদা কার্যকর ছিল। তাদের দীন তাদের দ্বারা বড় বড় কুরবানী অতি সহজ করিয়ে নিত। কারণ দীন এবং দীনের সত্যতার ব্যাপারে তাদের ঈমান ছিল অত্যন্ত সতেজ ও সজীব।

অন্যান্য ধর্মের ঠিকাদারদের এবং সত্য দীনের ধারক-বাহকদের মধ্যে পার্থক্য ছিল এমন যেমন ফটো ও জীবন্ত মানুষের, আগুন ও আগুনের ছবির মধ্যকার পার্থক্য। সাহাবায়ে কেরামের নতুন এই ঈমান ও বিশ্বাস তাদের ধমনীতে এমন অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিল যারাই এর প্রতিরোধে নেমেছে, এই বিশ্বাস ও ঈমান থেকে বঞ্চিত যে শক্তিই তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মোমের তৈরি মূর্তির মতো গলে পড়ে গেছে অথবা নিজের মঙ্গলের কথা ভেবে সামনে থেকে সরে গেছে। কারণ তাদের তলোয়ারে লোহার উগ্রতা ছিল না, ছিল ঈমানের অগ্নিশিখা। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, ছেঁড়া পোশাকে আবৃত্ত সেই মুজাহিদরা অস্ত্রের বলে লড়তেন না, তারা লড়াই করতেন ঈমানের বলে। এজন্য তাদের সামনে বেঈমানরা বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারতো না। তাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, যদি পৃথিবীর সবগুলো তলোয়ার একটির পর একটি করে আমাদের গর্দানে পড়তে থাকে আর আল্লাহর আদেশ না হয় তাহলে কেউ আমাদের গর্দান উড়াতে পারবে না। আর যদি আল্লাহর হুকুম হয় তবে তলোয়ারের একটি আঘাতই আমাদের গর্দান উড়ানোর জন্য যথেষ্ট।

নতুন এই ঈমান গরীব আরবদের অন্তর থেকে দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের সকল অনুভূতি সম্পূর্ণ নির্মূল করে দিয়েছিল। তাই আমাদের দূত যখন ইরানের রাজ দরবারে হাজির হলো তখন তার তলোয়ারের বুকটা বাঁকানো ছিল, ঘোড়াটি ছিল নেহায়েত ছোট্ট কিন্তু তাঁর ঈমান ছিল দীপ্তিমান। আর এ শক্তিই ছিল সকল

শক্তির ঊর্ধ্বে। যে কারণে ইরানের রুস্তম পালোয়ান পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। ইরানের দরবারের সকলেই নিজেদের ব্যাপারে আশঙ্কায় ভুগছিল। মূলত এই নতুন ঈমানের শক্তিতেই এই দূত বীরত্বপূর্ণ ও শঙ্কাহীন ভঙ্গিতে দরবারের মূল্যবান কার্পেট মাড়িয়ে ঘোড়ায় চড়ে সিংহাসনের কাছে চলে গিয়েছিলেন। আর নিজের বর্শাটি গেড়ে নিয়েছিলেন শাহী তখতে।

প্রকৃত ঈমান কী?

ঈমানের এই পার্থক্যের কারণেই রাসূল সা. এর আবির্ভাবের সময় নামায যদিও ছিল কিন্তু তাতে ছিল না খুশুখুযু। হজ্জ ছিল কিন্তু ছিল না এর রূহ। কিন্তু তখন লোকেরা রাসূল সা. এর ওপর ঈমান আনল তখন তিনি তাদের মধ্যে এমন ঈমান সৃষ্টি করে দিলেন যা শুধু হজ্জ ও নামাযের সময়ই নয় অন্য সময়ও তাদের ওপর হজ্জ ও নামাযের অবস্থা ছেয়ে থাকতো। মনে হতো সারাক্ষণ তাদের দৃষ্টিতে ভেসে বেড়াচ্ছে আল্লাহ ও আখেরাত। এই দুনিয়াতে বসেই তারা বেহেশতের সুগন্ধি পর্যন্ত পেতে শুরু করেন।

এক সাহাবীর ঘটনা

এক যুদ্ধের ঘটনা। রাসূল সা. যুদ্ধের ময়দানে এক সাহাবীকে বললেন, অমুকের একটু খোঁজ নিয়ে দেখ তো! সে কোন অবস্থায় আছে? (অর্থাৎ সে সহীহ-সালামতে আছে, নাকি আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কোথাও পড়ে আছে, না প্রাণই চলে গেছে।) সাহাবী সতীর্থ বন্ধুকে খুঁজতে বের হলেন। খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় গিয়ে দেখলেন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। তখন তাঁর একেবারে শেষ সময়। কাছে গিয়ে বললেন, রাসূল সা. আপনার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। ওই সাহাবী উত্তর দিলেন, নবীজীকে আমার সালাম বলো আর বলো, আমি বেহেশতের সুগন্ধি পাচ্ছি।

হযরত আবু হুরায়রা রা. এর ঘটনা

হযরত আবু হুরায়রা রা. এর ঘটনা বর্ণিত আছে। তিনি জীবন সায়াহ্নে উপনীত। কঠিন পীড়ায় ভুগছেন। পাশেই বসা তার সহধর্মিনী। স্বামীর কষ্ট দেকে তার মুখ থেকে অজ্ঞাতে বেরিয়ে এলো 'আহ!, কী কষ্ট হচ্ছে! হযরত আবু হুরায়রা রা. এর জ্ঞান ফিরলে তিনি বললেন, তুমি কি একথা বলছ 'আহ! কী কষ্ট!' না না বরং বলো, আহ! কী আনন্দের সময়। আহ! কী আনন্দের সময়! কাল মিলিত হবো বন্ধুদের সাথে, মুহাম্মদ সা. ও তার দলের সাথে।'

মোটকথা, দীনের হাকিকতের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ঈমান এত দৃঢ় ও সবল ছিল যে, দেখা জিনিসের প্রতিও আমাদের বিশ্বাস এত সুদৃঢ় ও কঠিন হয় না। কারণ তাদের ঈমান ছিল নয়া, তাজা ও প্রাণবন্ত। আর যেকোনো নতুন জিনিসের মধ্যেই এক ধরনের শক্তি, সজিবতা ও প্রাণময়তা থাকে।

হযরত আবু যর গিফারী রা. এর ঘটনা

হযরত আবু যর গিফারী রা. যখন রাসূল সা. এর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তার মধ্যে সত্যের প্রকাশ ও ঘোষণাদানের প্রেরণা উথলে উঠল। অথচ তখন এটা ইসলামের দুশমনদের দৃষ্টিত এক বিরাট বড় অপরাধ। আবু যর গিফারী রা. তাদের মধ্যে দাঁড়িয়েই সুউচ্চ স্বরে কালেমা উচ্চারণ করলেন। কাফের বেঈমানরা চারদিক থেকে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল! নির্মমভাবে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকল। কিন্তু হযরত আবু যর রা. আঘাতের এই নির্মমতা সত্ত্বেও এমন অলৌকিক স্বাদ ও পুলক অনুভব করলেন–যার টানে পরের দিন গিয়ে পুনরায় হাজির হলেন সেখানে। পুনর্বার প্রহৃত হলেন, নির্যাতিত হলেন। মূলত এটা ছিল নয়া ঈমানের পয়গাম, তাজা ঈমানের সৌরভ। তাজা, সজীব ও প্রাণবন্ত এই আহবানে সাড়া দিয়ে কেউ যখন দীনের পথে নেমে আসে তখন প্রতিটি কষ্ট ও আঘাতই তার কাছে অলৌকিক স্বাদ ও মধু নিয়ে হাজির হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ যুলবাজাদাইন রা. এর ঘটনা

সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ যুলবাজাদাইন রা. ইসলাম গ্রহণের আগে ইসলাম গ্রহণের আগে বাবা মারা যাওয়ার কারণে থাকতেন চাচার কাছে। তার কাজকর্ম করতেন। ছাগল চরাতেন। ইসলামের আহবান তার কানে পৌছল। একদিন সিদ্ধান্ত নিলেন আজ মুহাম্মদ সা. এর সঙ্গে দেখা করে ইসলাম গ্রহণ করবেন। তিনি ছাগলের পাল চাচাকে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, চাচা! আজ থেকে আমি আর রাখালী করব না। আমাকে এ দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিন। আমি ইসলাম গ্রহণ করতে যাচ্ছি। চাচা বললেন, তোমার গায়ে যে চাদর আছে তা আমার, এটা খুলে রেখে যাও। জালেম তাঁর গায়ের সবকটি কাপড় খুলে রেখে একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে দেয়। কোনোক্রমে তিনি তার মায়ের কাছে পৌছেন। পরনের কাপড় চান, মা একটা কম্বল এনে দেন। সেটাকেই দু'ভাগ করে এক ভাগ পরিধান করে আরেক ভাগ গায়ে জড়িয়ে এসে হাজির হন নবীজীর খেদমতে। অতঃপর অবশিষ্ট জীবন কাটিয়ে দেন হযরতের কদমের কাছে। যেহেতু তিনি দুই কম্বল সম্বল করে বেরিয়ে এসেছিলেন এ কারণেই তার উপাধি পড়ে যায় বাজ্জাদাইন বা দুই কম্বলওয়ালা।

তাজা ঈমানের আকর্ষণ

নতুন ও তাজা ঈমান এই পার্থিব জগতকে মূল্যহীন করে দেয়। এই তাজা ঈমানের পরশ যে পেয়েছে সে সঙ্গে সঙ্গে দাঈ ও মুজাহিদ হয়েছে। এক যুদ্ধের কথা। রোমক সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। শত্রুপক্ষের সারি থেকে এক যোদ্ধা বেরিয়ে এলো এবং হযরত খালিদ ইবনে ওলিদকে চিৎকার করে ডাকল। তিনি এগিয়ে গেলেন। সে তখন যুদ্ধ না করে ইসলাম সম্পর্কে কিন্তু প্রশ্ন করল। অবশেষে বলল, তোমাদের ধর্মে প্রবেশ করার নিয়ম কী? খালিদ ইবনে ওলিদ রা. সব প্রশ্নের জবাব দিলেন এবং তাকে তাবুতে নিয়ে আসলেন। তাকে গোসল করিয়ে কালেমা পড়িয়ে মুসলমান করে নিলেন। এরপর সে দু রাকাত নামায আদায় করল। এরপর ফিরে এলো যুদ্ধের ময়দানে। অত্যন্ত বীরত্ব ও বাহাদুরীর সঙ্গে যুদ্ধ করে অবশেষে শহীদ হলেন।.

এই হলো নতুন ঈমানের আকর্ষণ, তাজা ঈমানের উষ্ণতা। হযরত খালিদ ইবনে ওলিদ রণাঙ্গন থেকে এক শত্রুকে ধরে এনে ইসলামের খাদেম বানিয়ে নিলেন। আর সেও ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ইসলামের জন্য নিজের জীবনটাকে উৎসর্গ করে দিলেন।

আমাদের আহবান

আমাদের আহবান মূলত ঈমানের ওই প্রকৃত শক্তি অর্জনের আহবান। আর এমন ঈমান সৃষ্টি করার দাওয়াত যাতে আমাদের সঙ্গে সংশিষ্ট বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনেরাও সে সৌরভ অনুভব করে। ফুলে যদি সুগন্ধি থাকে তবে তা অনুভূত হবেই। আগুনে যদি উষ্ণতা থাকে তবে তা অবশ্যই অনুভব করা যাবে। এমনিভাবে আমাদের ঈমানে যদি সৌরভ থাকে, উষ্ণতা থাকে তবে এর দ্বারা অন্যেরা অবশ্যই প্রভাবিত হবে। অন্যথায় অন্যের প্রতি অভিযোগ বা অনুযোগ করে কোনোই লাভ নেই।

হিমসে মুসলমানদের জয় হলো। সেখানে কর আদায় করা হলো। ইসলামী শাসনব্যবস্থা চালু করা হলো। কিন্তু অল্প কদিন পরই তৎকালীন খলিফার আদেশে হিমস ছাড়তে হলো। শুধু তাই নয়, একটি পাই পাই করে হিসাব করে আদায়কৃত করের টাকা ফেরত দিয়ে দিলেন।

এটা ছিল তাদের ঈমানের প্রভাব। হিমসের ইহুদী ও খৃষ্টানেরা এর দ্বারা তাদের ঈমানের খুশবু অনুভব করলেন। সুতরাং মুসলমানরা যখন বিদায় হয়ে চলে আসছিল তখন ওই লোকেরা কাঁদতে লাগল। আর দুআ করছিল, আল্লাহ তোমাদেরকে যেন পুনরায় ফিরিয়ে আনেন। এমনিভাবে যদি আমাদের মধ্যে কোনো ঈমানী শক্তি, আত্মিক বল ও চারিত্রিক বড়ত্ব সৃষ্টি হয় তবে এটা অসম্ভব যে, অন্যেরা আমাদের ঈমানের সুরভিত গন্ধে আলোড়িত হবে না।

আজ মুসলমানদের কাছে অর্থ-বিত্ত, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি কোনোটির অভাব নেই। প্রকৃত অভাব যে কারণে মানুষের দৃষ্টি বদলে গেছে এবং যে কারণে চলমান পৃথিবীর দৃষ্টিতে মুসলমানদের কোনোই মূল্য নেই তা হলো ঈমানের সজিবতার অভাব, নতুনত্বের অভাব। এই অভাব ও শূন্যতার প্রভাব

শুধু আজই নয় তখন থেকেই প্রকাশ পেতে শুরু করেছে যখন মুসলমানদের হাতে ক্ষমতা ছিল। বনু উমাইয়ার শাসনামলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এক অমুসলিম করদাতা রাজ্যে কর আদায় করতে গেল। এটাই প্রথমবার ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো কর আদায়কারী কর্মকর্তা শান-শওকতসহ কোনো রাষ্ট্রে কর আদায় করতে যায়। তাদের এই বেশভূষা দেখে সে এলাকার শাসক বলল, আল্লাহর সেই বান্দারা কোথায় যারা এর আগে কর আদায় করতে আসত? যারা ঘাসের তৈরি মোটা কাপড় পরত। যাদের মুখ থেকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা আর গায়ের পোশাক থেকে দারিদ্র ঠিকরে পড়তো। তাকে জানানো হলো, তারা তো প্রথম যুগের মুসলমান। সেই পুরনো যুগের মুসলমান কোথায় পাবেন? তখন সে এলাকার শাসক বলল, তাহলে আমরা এক পয়সাও কর দেব না। এতদিন তো আমরা তাদের ভয়ে যাকাত দিতাম। তারা এসে যখন বলতেন, আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহ যা দিতে বলেছেন তা দিয়ে দাও। তখন আমরা তাঁদের কথা ফিরিয়ে দিতে পারতাম না। তাদেরকে ভয় হতো, কিন্তু তোমাদেরকে ভয় করার তো কোনো কারণ নেই। আমরা কর দেব না, তোমরা যা পার কর।

এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সজীব ঈমান

আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো সজীব ও তরতাজা ঈমানের। যে ঈমান মানুষের পূর্ণ জীবন ও কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করবে। নিজের অনুগত করে নেবে। সেই ঈমান আজ কোথাও নেই। ইউরোপের কারখানাগুলো দেখুন! মানুষেরা যা প্রয়োজন তা তো পুরোপুরি তৈরি হচ্ছেই-এমনকি যার কোনোই প্রয়োজন নেই তাও তৈরি হচ্ছে। অতঃপর যার যেটা প্রয়োজন বাজার থেকে সংগ্রহ করে নিচ্ছে। কিন্তু ইউরোপের কারখানা যেটা তৈরি করতে পারে না সেটা হলো খালিদ বিন ওলিদ রা. ও আবু যর গিফারী রা.এর ঈমান। এ কারণেই ইউরোপ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, তারা সব পারলেও এই পৃথিবীকে অন্যায় ও অপরাধ থেকে মুক্ত ও পবিত্র করতে অক্ষম। বড় বড় চরিত্র ও মনোবিজ্ঞানীরা যেখানে জঘন্যতম অপরাধের শিকার, চারিত্রিক ব্যাধিতে আক্রান্ত, সেখানে অন্যদের শোধরাবার পথ কোথায়? ইউরোপের এক চরিত্র ও মনোবিজ্ঞানীর কথা যিনি প্রতি বছর তার সেবা গ্রহণ করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করতেন-তিনিই একবার এক মহিলার গলা থেকে হার চুরি করার সময় পাকড়াও হন। এই 'চার্চিল ট্রুমানম্যান'ই যদি সমগ্র পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তার পাহারাদার নিযুক্ত হন এবং সুযোগমত যদি ব্যক্তিগত ক্ষমতা কিংবা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষমতা দখল করার লক্ষ্যে এটম বোমা মেরে দেশের পর দেশ ধ্বংস করে দেয়-যেমনটি গত লড়াইয়ে জাপানের দুটি নিরপরাধ শিল্প নগরীর সাথে করা হয়েছে তাহলে আশ্চর্যের কী আছে!

আমি কিন্তু নতুন কোনো ধর্মের দিকে ডাকছি না। নতুন কোনো দীনের কথাও বলছি না। তবে এক নতুন ও তাজা ঈমানের দাওয়াত অবশ্যই দিচ্ছি। আমি বলছি, আমাদের ঈমানকে তাজা করতে হবে, নতুন করতে হবে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও কুরআনে কারীমে বলেছেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আন।' (নিসা : ১৩৬)

হযরত রাসূলে কারীম সা. ইরশাদ করেন, 'তোমরা তোমাদের ঈমানকে নয়া কর, নবায়ন কর।'

আমরা মূলত এরই দাওয়াত দিচ্ছি আমি বরং পরিষ্কার ভাষায় বলছি, আমরা, আমাদের যারা বুযুর্গ, বড় বন্ধু এবং ছোট সকলেই এর মুখাপেক্ষি। আমাদের সকলের ঈমানই তাজা করা দরকার, যেমনটি ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈমান। আমাদের এই ভারতবর্ষের সেই মহান দাঈ ও মুজাদ্দিদ যিনি মানুষকে ঈমান তাজা ও নতুন করার দাওয়াত দিতেন তাঁর আমলেও কিন্তু এখানে ঈমান ছিল, ইসলাম ছিল, আলেম ছিল, বুযুর্গ ছিল, সবই ছিল। কিন্তু তিনি যখন নয়া ঈমানের দাওয়াত নিয়ে উঠেছেন তখন উম্মতের মধ্যে ঈমানদীপ্ত নতুন জীবনের সূচনা হয়েছে। অতঃপর যারা আগে কেবল নামে মুসলমান ছিলেন পুনরায় ঈমানের নতুনত্বে শাণিত হয়ে উঠেছেন তখন তাদের মাধ্যমেও ইসলামের প্রথম যুগের অনুরূপ ইতিহাস সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। তাজা হয়ে উঠেছে আমাদের মৃত ইতিহাস এবং প্রমাণিত হয়েছে, সত্যিই ঈমানে অনেক শক্তি থাকে এবং সেই শক্তি যেকোনো যুগেই জাগিয়ে তোলা যায়।

এখন পৃথিবীর সবকটি মুসলিম দেশেই ঈমানী ডাকের প্রতিধ্বনি হচ্ছে। তুরস্ক, মিশর, হিজায সর্বত্রই ঈমানকে বাড়িয়ে তোলার, শাণিত করার প্রয়াস চলছে এবং সেই প্রয়াস সর্বাধিক জরুরী আমাদের দেশে। প্রয়োজনে ঈমানকে নতুন বিশ্বাসে দীপ্ত করে তোলা এবং এই আহবানকে সর্বত্রই ছড়িয়ে দেয়া। আবারও বলি, আমাদের পুরাতন ঘুণেধরা জীর্ণশীর্ণ ঈমান জীবনপথের সমস্যাবলীর মোকাবিলা করতে অক্ষম। ছোটখাট সমস্যা হলে দুর্বল ঈমানের পক্ষে সেটা জয় করা সম্ভব হয়। কিন্তু কঠিন ও অসম পরিস্থিতিতে জয় করার জন্যে প্রয়োজন শীশাঢালা প্রাচীরের মতো সবল ঈমান। যে ঈমানের বল ও শক্তি হবে সকল বস্তুশক্তির উর্ধ্বে। বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা বর্তমানে প্রতিকূল অবস্থার শিকার। সে কারণে আমাদের ঈমানও হতে হবে সতেজ ও দৃঢ়। আমাদের জীবনে আনতে হবে বিপ্লবী পরিবর্তন। ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানদের বিশ্বাস, চেতনা ও প্রেরণায় গড়ে তুলতে হবে আমাদের ঈমান, বিশ্বাস ও জীবন। অবস্থার পরিবর্তন আর পরিস্থিতি কব্জায় আনার জন্য এটাই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, যা এখনও বাকী।

দৃঢ়তা ও সত্যনিষ্ঠার সমন্বয় ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব

ওলামায়ে কেরামের এই মহতি মজলিসে কিছু আলোচনা করা অনেক দায়িত্বশীলতার বিষয়। প্রাচীন নীতিকথায় আছে 'প্রত্যেক স্থানের উপযোগী কথা সে স্থানের জন্য প্রযোজ্য।' আমি চেষ্টা করব এই মহতি সমাবেশের শান অনুযায়ী কিছু আরজ করতে।

ছোট্ট বিষয় বড় শিক্ষা

মানুষের ধর্ম হলো তারা ছোট ছোট ঘটনা ও নিত্যদিনকার বিন্দুবিন্দু অভিজ্ঞতার দ্বারা বড় বড় ফলাফল বের করে নেয়। এ ক্ষেত্রে হযরত শেখ সাদী রহ. ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্ব। এমনিভাবে মাওলানা রুমী রহ.-ও অসাধারণ দক্ষতা রাখতেন। তাঁরা নিত্যকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা দ্বারা অত্যন্ত হিকমতপূর্ণ বাণী ও তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল বের করতেন। আমিও আজ আমার নিজের একটি প্রতিক্রিয়া ও লব্ধ শিক্ষার কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। আপনারা জানেন আমি এক দীর্ঘ সফর করে এখানে এসেছি। দিল্লী থেকে সফর শুরু করে হায়দারাবাদ এসে পৌঁছেছি। আল্লাহ মালুম গাড়ি কত দিকে মোড় ফিরেছে, কোন কোন এলাকা মাড়িয়ে এসেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো–দিকনির্ণয়ক যন্ত্র সব সময় সঠিক কেবলা নির্দেশ করেছে। সে গাড়ির মোড় ঘোরারও কোনো পরোয়া করেনি, দিক পরিবর্তনের বিষয়টিরও কোনো পাত্তা দেয়নি। আমার বড় ঈর্ষা লাগল যে, অতি নগণ্য একটি জড় বস্তু যা মানুষের তৈরি, সে এত বিশ্বস্ত, এত সুদৃঢ়, এত দায়িত্বশীল এবং এত নীতিবান! সে একবারের জন্যও দেখেনি গাড়ি কোন দিকে মোড় নিচ্ছে।

কেবলা ঠিক রাখতে হবে

অথচ মানুষ (যারা আশরাফুল মাখলুকাত) বরাবরই তারা দিক পরিবর্তন করে চলেছে। আমি দেখলাম উল্লিখিত যন্ত্রটি প্রতিটি স্থানে সঠিক কেবলা নির্দেশ করছে। আমি এর ওপর আশ্বস্ত হলাম এবং তার নির্দেশ মোতাবেক নামাযও

আদায় করলাম। এ ঘটনার দ্বারা আমার লজ্জাবোধও হলো আবার শিক্ষাও অর্জিত হলো যে, কেবলা নির্দেশক যন্ত্র কোনো কিছুর পরোয়া করেনি, তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালনেও কোনো প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন করেনি। এতে আমার মনে হলো, ওলামায়ে দীনকেও প্রকৃত অর্থে দিকনির্ণয়ক যন্ত্র হওয়া আবশ্যক। তাদের মধ্যেও এ যন্ত্রের মতো দৃঢ়তা থাকা উচিত। যুগের হাওয়া যে দিকেই বাহিত হোক, যতই বলা হোক তাদেরকে 'ছুটে চল স্রোতের টানে', যেভাবেই বুঝানো হোক তাদের 'যুগের তালে তাল মিলাও' কিন্তু তাদের বিশ্বাস হবে আল্লামা ইকবালের (যিনি উচ্চ শিক্ষিত দার্শনিক ও কবি ছিলেন) শিক্ষার ওপর 'তুমি মূল ধরে থাক, জামানা ছুটবে তোমার পেছনে, তুমি কেন যাবে জামানাকে ধরতে?'

আলেমদের জন্য চাই স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য

ওলামায়ে কেরামের শানও এমনই হওয়া চাই। উম্মতে মুসলিমা এবং অন্যান্য শিক্ষিতদের থেকে তাদের একটু ভিন্নই হতে হবে। মুসলিম উম্মাহকে দেয়া হয়েছে একটি মাত্র কেবলা। তারা যেখানেই থাকুক এই একই কেবলার দিকে মুখ করবে। যে উম্মতকে একটি নির্দিষ্ট কেবলা দেয়া হয়েছে, তাদেরকে এই ইশারা দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের অন্তরের কেবলা, তোমাদের কেবলা, তোমাদের প্রয়োজন, তোমাদের ধ্যান-ধারণা এবং তোমাদের সকল শ্রম ও সাধনার উৎসমূল একই হওয়া উচিত।

নামাযে যেমন খানায়ে কাবার দিকে মুখ করবে তেমনি সমস্ত কাজ-কর্ম, শ্রম-সাধনা ও উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার (যিনি মাবুদ ও মাকসুদে হাকিকী) সন্তুষ্টি তালাশ করবে। আল্লাহর ফজল ও করমে আপনারা শুধু আলেমই নন বরং আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে দীনী নেতৃত্বর গুরুদায়িত্বও দান করেছেন। বিশেষত আজকের এই মহতি জলসায় উপস্থিত সম্মানিত ওলামায়ে কেরামের খেদমতে আমি কিছু নিবেদন করতে চাই।

আকায়েদ ও শরীয়াতের ব্যাপারে কোনো ছাড় নেই

প্রথমত, আকায়েদ ও শরীয়তের সীমারেখার মাসআলা। এতে ওলামায়ে কেরামকে ধ্রুবতারার মতো হওয়া চাই। বড়র চেয়ে বড় মানুষকেও যদি এর সামনে রাখা হয় তবুও তার কোনো পরোয়া করবে না। সে প্রকৃত দিক বর্ণনা করেই যাবে। আকীদা ও শরীয়তের সীমারেখার ব্যাপারে কোনো প্রকার আপস বা বিবেচনার সুযোগ নেই। হিকমত এক জিনিস আর চাটুকারিতা অন্য জিনিস। এতদুভয়ের মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে। হ্যাঁ, মানুষ সত্য ও ন্যায় কথা হিকমতের সঙ্গে বলতে পারে। তার বলার পদ্ধতিটা হবে প্রজ্ঞাপূর্ণ। ইরশাদ হয়েছে– 'তোমার প্রভুর দিকে লোকদেরকে আহবান কর প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ

দ্বারা।' তবে তোষামোদ করা যাবে না। কুরআনে বলা হয়েছে 'তারা চায় আপনি যদি নমনীয় হন, তারাও নমনীয় হবে।'

আল্লাহর রাসূল সা. কে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে 'বাস্তবায়ন করুন আপনাকে যা নির্দেশ করা হয়েছে। আর মুশরিকদেরকে এড়িয়ে চলুন।'

এখানে মুশরিকদের এড়িয়ে চলার কথা বলা হয়েছে। তাওহীদ ও শিরকের ব্যাপারে 'পালন করুন যা নির্দেশ করা হয়েছে' এর ওপর দৃঢ়ভাবে আমল করতে হবে। নমনীয় ও বিবেচনা অন্য ক্ষেত্রে হতে পারে, কিন্তু তাওহীদ, সুন্নাত এবং অকাট্য দীনের ব্যাপারে কোনো প্রকার আপস বা সমঝোতার সুযোগ নেই। ওলামায়ে দীনের দায়িত্ব হলো তাওহীদের ব্যাপারে নিস্পৃহ ও পরিষ্কার কথা বলে দেয়া, তবে তা হিকমতের সঙ্গে। গালিবের এ কথার মতো যেন না হয়ে যায়- 'বলে সে ভালো কথা কিন্তু মন্দভাবে।'

বিকৃতি ও ভুল বুঝাবুঝি থেকে বাঁচুন

ভালো কথা ভালোভাবেই উপস্থাপন করবে। কোনো ফিতনার সূত্রপাত হলে ওলামায়ে কেরামের উচিত অধিক নম্র ভাষা ব্যবহার করা, হিকমত ও প্রজ্ঞার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেয়া। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বিকৃতি বা কোনো প্রকার ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। এ কর্মপন্থা অবলম্বনের কারণেই আজ পর্যন্ত এই দীন অবিকৃতভাবে টিকে আছে, দুধ ও পানির মধ্যে কোনো সংমিশ্রণ ঘটেনি। যার ধ্বংসের সাধ আছে সে সাধে ধ্বংসে পতিত হয়েছে, কিন্তু সে এর জন্য শরীয়ত ও শরীয়তের ধারকদের কোনো অপবাদ দিতে পারবে না।

গভীরভাবে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে যদি ইতিহাস পাঠ করা হয় তাহলে জানা যাবে যে, এই উম্মতের মধ্যে এমন কোনো যুগ অতিবাহিত হয়নি যে যুগে তারা সম্মিলিতভাবে কোনো গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে তো অনেকেই গোমরাহীর শিকার হয়েছে, কিন্তু ঐক্যবদ্ধভাবে গোটা উম্মাহ কোনোদিন এমন পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়নি।

হাদীস শরীফে রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, 'আমার উম্মত সম্মিলিতভাবে কোনো গোমরাহীতে স্থির থাকবেনা।' পক্ষান্তরে ইহুদী ধর্ম একদম শুরুর দিকেই বিকৃতির শিকার হয়েছে। এমনিভাবে খৃষ্টবাদ তার শৈশবে ও সূচনা পর্বেই বিচ্যুতির যে ধারায় নিপতিত হয়েছিল সেখান থেকে শতশত বছর অতিবাহিত করে বর্তমান অবস্থায় এসে উপনিত হয়েছে। এজন্য কুরআন মজীদে নাসারাদেরকে 'দোয়াল্লীন' শব্দে অভিহিত করেছে। তারা যেদিকেই চলবে বিভ্রান্ত হয়ে অন্য পথে ছিটকে পড়বে।

ওলামায়ে কেরামের বিশেষ শান

কিন্তু আল্লাহর অগণিত শোকর ইসলাম এ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। এখন পর্যন্ত তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য, সুন্নাত ও বিদআতের পার্থক্য, ইসলাম ও জাহিলিয়াতের পার্থক্য, অমুসলিম সমাজ-সভ্যতা আর মুসলিম সমাজ-সভ্যতার পার্থক্য সম্পূর্ণ স্পষ্ট। কোনো দেশ কোনোকালে বিশেষ কোনো কারণে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে যাওয়া অথবা ফিতনার শিকার হওয়া স্বতন্ত্র বিষয়। এমতাবস্থায়ও ওলামায়ে কেরাম ঐক্যবদ্ধভাবে ফিতনার মোকাবেলা করেছেন এবং অবস্থা পরিশুদ্ধির জন্য সাধনা চালিয়েছেন। গোটা মুসলিম উম্মাহকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ হচ্ছে-'হে ঈমানদগণ! তোমরা আল্লাহর অধিকার সংরক্ষণকারী হয়ে যাও।'

এই আয়াত যদিও সমগ্র উম্মাহর ক্ষেত্রে ব্যাপক কিন্তু এটা ওলামায়ে কেরামের একটা বিশেষ শান। তাদের হতে হবে সত্য ও ন্যায়ের সাক্ষী এবং নেতৃত্বদানকারী। উম্মতে মুসলিমার দায়িত্ব যদি হয় গোটা দুনিয়ার হিসাব নিকাশ তবে ওলামায়ে দীনের দায়িত্ব হলো মুসলিম সমাজের বিচার-বিশ্লেষণ করা যে, এই সমাজ কোথা থেকে সীরাতে মুস্তাকীম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কোথা থেকে তারা সুন্নতে নববীর বিন্দুরেখা হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে তাদের কাজ হবে সম্পূর্ণ ব্যারোমিটারের মতো। এ যন্ত্রটি যেকোনো স্থানে যেকোনো মৌসুমে বাতাসের গতিবিধি বলে দেয়, সঠিক রিপোর্ট পেশ করে।

সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না

এমনিভাবে ওলামায়ে কেরামের দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে, তারা মুসলমানদেরকে জীবনের বাস্তবতা, রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তন এবং চাহিদা সম্পর্কে সচেতন করবে। তাদের চেষ্টা থাকবে মুসলিম সমাজের সম্পর্ক জীবন ও পারিপার্শ্বিকতা থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। কারণ দীন ও মুসলমানদের সম্পর্ক যদি জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আর খেয়ালী দুনিয়ায় জীবনযাপন করতে থাকে তাহলে দীনের আওয়াজ প্রভাবহীন হয়ে যাবে, তারা দাওয়াত ও ইসলাহের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারবে না।

শুধু তাই নয়, দীনের ধারকদের এ রাজ্যে বসবাস করা মুশকিল হয়ে যাবে। ইতিহাস আমাদেরকে জানান দেয়, যেখানে ওলামায়ে কেরাম সবকিছু করছে কিন্তু জীবনের নিগূঢ় বাস্তবতা সম্পর্কে উম্মতকে সম্যক অবগত করেনি, এই পরিপার্শ্বে তাকে তার দায়িত্ব পালনের শিক্ষা দেয়নি, একজন যোগ্য নাগরিক ও নেতৃত্বদানের যোগ্যতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়নি, সেখানে সেই রাষ্ট্র তাদেরকে এমনভাবে উগরে ফেলেছে যেমনভাবে অবৈধ লোকমা মুখ থেকে উগরে ফেলা হয়। কারণ তারা তাদের নিজস্ব অবস্থান বানিয়ে নিতে পারেনি। বর্তমান বিশ্বের মুসলমানেরা অভিজ্ঞ ও বাস্তবতাপ্রিয় নেতৃত্বের বড়ই মুখাপেক্ষী।

আপনি যদি মুসলিমদেরকে নিয়মিত তাহাজ্জুদগুজার বানান, সবাইকে মুত্তাকী-পরহেজগার বানিয়ে দেন কিন্তু পরিপার্শ্বের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক না থাকে, তারা জানে না রাষ্ট্র কোন দিকে যাচ্ছে; রাষ্ট্র অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, দুশ্চরিত্র ও অনৈতিকতার তুফান মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ছে, মুসলমানদের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হচ্ছে—তাহলে ইতিহাস সাক্ষী, তখন শুধু তাহাজ্জুদ নয় পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করাও মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।

যদি আপনি এই প্রতিবেশে দীনদারদের স্থান তৈরি না করেন, এমন একনিষ্ঠ যোগ্য নাগরিক তৈরি না করেন যারা রাষ্ট্রকে অসৎ পথ থেকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও সাধনা চালিয়ে যাবে, তাহলে স্মরণ রাখুন! ইবাদত ও দীনের নির্দেশসমূহ তো বিচ্ছিন্ন হবেই, এমন পরিস্থিতিও আসতে পারে—মসজিদসমূহ টিকিয়ে রাখাও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

প্রতিবেশই আপনার কর্মক্ষেত্র

আপনি যদি মুসলমানদেরকে অপরিচিত বানিয়ে প্রতিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন, জীবনের বাস্তবতা থেকে তাদের চোখ বন্ধ রাখেন, আর রাষ্ট্রে ঘটমান বিপব এবং জনসাধারণের মন-মগজে শাসনকারী আইন-কানুন সম্পর্কে তারা বেখবর থাকে, তাহলে নেতৃত্ব তো দূরের কথা (যা খায়রে উম্মতের দায়িত্ব) নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাও কঠিন হয়ে যাবে। মিশর বিজয়ী সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আস রা. যখন মিশর বিজয় করলেন তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর দূরদৃষ্টিতে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, ইনশাআল্লাহ মিশর শত নয় হাজার বছর পর্যন্ত ইসলামের পবিত্র ছায়াতলে থাকবে। কারণ ইসলামের প্রাণকেন্দ্র হেজাজ তার একদম নিকটে, রোম সাম্রাজ্য এখান থেকে বিতাড়িত হয়েছে, কিবতি, খৃষ্টবাদ ও রাজতন্ত্র নির্মূল হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও তিনি আরবীদের এবং মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করেছেন, 'স্মরণ রেখো! তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করছ। সীমান্তে সর্বক্ষণ সতর্ক পাহারাদারী বজায় রেখো। নাকের ডগায় শত্রু অবস্থান করছে, এজন্য গাফলতের কোনো অবকাশ নেই। অজ্ঞতা কিংবা এর ভান করার কোনো সুযোগ নেই।'

যুগের পাথেয় সংগ্রহ করা প্রয়োজন

আমরা বর্তমানে যারা যে রাষ্ট্রে অবস্থান করছি সে রাষ্ট্রের পরিস্থিতি অতি দ্রুতগতিতে পরিবর্তন হচ্ছে, এ দেশ দুনিয়ার শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এ দেশে অনেক দর্শন, অনেক নেতিবাচক শক্তি, অনেক ধ্বংসাত্মক আন্দোলন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, অনেক কর্মসূচী পালিত হচ্ছে, শিক্ষাব্যবস্থা প্রায়ই পরিবর্তিত হচ্ছে, তা কখনও দীনী আকীদার ওপর প্রচণ্ডভাবে আঘাত

হানছে, চাপিয়ে দেয়া শিক্ষা ও জাতীয় ভাষাও নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করছে—এমতাবস্থায় আমাদেরকে সার্বিক অবস্থার পুরোপুরি বিশ্লেষণ প্রয়োজন এবং নিজেদের সংরক্ষণের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করা দরকার।

যোগ্যতা অর্জন করলে আপনিই হবে রাহবার

এরই পাশাপাশি মুসলমানদেরকে বলা প্রয়োজন যে, দেখ, এ দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো তোমাদের দায়িত্ব। তোমরা ঈমান ও শৃঙ্খলার সঙ্গে প্রয়োজনীয় ভূমিকার মাধ্যমে এখানে থাক। তোমরা যদি এখানে হযরত ইউসুফ আ. এর নমুনা পেশ কর তবে এমন একটা সময় আসবে যখন অতি গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক জিম্মাদারীও তোমাদের ওপর বর্তিত হবে।

হযরত ইউসুফ আ. যাঁকে আল্লাহ তাআলা হাফিজ ও আলিম গুণে গুণান্বিত করেছিলেন তিনি যখন দেখলেন, এ দেশে ওই সময় পর্যন্ত দীনের প্রচার প্রসার হবে না এবং দীনের অবস্থান সুদৃঢ় হবে না যতক্ষণ না দীনের মাকাম তৈরি না হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সেখানে নিজের যোগ্যতা, সৎ মনোবৃত্তি, মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং ন্যায় ও সমতার প্রমাণ না দিবেন, আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজের ভক্ত-অনুরক্ত না বানাবেন ওই সময় পর্যন্ত এদেশে এক আল্লাহর নাম নেয়াও মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যে এটা প্রমাণ করা দরকার যে, আমাদের ছাড়া এদেশ চলতে পারে না। আমরা না থাকলে এ দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।

বিচ্ছিন্নতার পরিণাম ভয়াবহ

স্মরণ রাখবেন, আমরা যদি রাষ্ট্রীয় বিষয়-আশয় থেকে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করে নিই, উষ্ণ-শীতল যে হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে তা থেকে বেখবর থাকি, আর এমন জায়গায় অবস্থান করি যেখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, ঠান্ডা-গরম কিছুই নাগাল পায় না-তাহলে এটা নিজেদের সঙ্গে যেমনি প্রতারণা তেমনি দীনের সঙ্গে অবিচার করার শামিল। জনপদে বাস করে কোনো ফিরকাই সময়ের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। হ্যাঁ, এর জন্য শর্ত ও সীমারেখা হচ্ছে আপনি সময়ের এই আবর্তে বিলীন হয়ে যাবেন না।

সব সময় নিজের পয়গাম ও দাওয়াতের সঙ্গে থাকবেন। আপনি আপনার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখবেন। আপনার ব্যক্তিত্বের ওপর অটল থাকবেন, নিজেকে অপাঙ্‌ক্তেয় বানিয়ে নেয়া থেকে দূরে থাকবেন। তবে জীবনের প্রবাহ থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হবেন না। আমি জাতীয় প্রবাহের কথা বলছি না (আল্লাহ না করুক, জীবনে যেন একবারও একথা উচ্চারণ না করি যে, জাতীয়তার প্রবাহে তাল মিলাও), না, জীবনের প্রবাহ থেকে আপনি পৃথক হবেন না। কারণ

জীবনের প্রবাহ থেকে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সে বিচ্ছিন্নই থেকে যায়। তার স্থান জীবিত মানুষের মধ্যে থাকে না।

ইসলাম সর্বকালের সর্বযুগের

আমি ইসলামকে এত সংকীর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ মনে করি না যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং জীবনের বাস্তবতার দিকে নজর দিলে কোনো ফরজ ছুটে যাবে, আকীদা-বিশ্বাসে কোনো ধ্বংস নামবে। আমাদের আকাবিররা রাষ্ট্র চালিয়েছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন কিন্তু তাদের তাহাজ্জুদ ছুটে যায়নি। সাধারণ কোনো সুন্নতও তরক হয়নি। হযরত সালমান ফারসী রা. এর ঘটনা। তিনি ছিলেন ইরাকের গভর্নর। মাদায়েনের রাজধানীতে থাকতেন। একবার তাঁর হাত থেকে কোনো খাদ্যদ্রব্য মাটিতে পড়ে গেলে তিনি উঠিয়ে পরিষ্কার করে তা খেয়ে ফেললেন। কেউ তাঁকে সতর্ক করে বলল, আপনি গভর্নর হয়ে এ কাজ করলেন। তিনি জবাব দিলেন 'আমি কি তোমাদের মত বেকুবদের কথায় প্রিয়নবী সা. এর সুন্নাত ছেড়ে দিব?'

আগুন আসলে পানি থাকবে না আর পানি আসলে আগুন থাকবে না–এমন হলে চলবে না। এটা ভুল ধারণা। আপনারা পূর্ণ দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ববোধ, তাকওয়া এবং ইবাদতের আধিক্যের দ্বারা একজন ভালো নাগরিক হতে পারেন। আমি মনে করি আপনারা এমন নাগরিক হতে পারেন যারা আল্লাহর সত্যিকার পূজারী ও মৌলিকত্যের ওপর পুরোপুরি অধিষ্ঠিত। বর্তমান শুধু হিন্দুস্থান নয় প্রায় সব মুসলিম দেশ বিশেষত আরব রাষ্ট্রসমূহের অবস্থা হচ্ছে সেখানেও ইউরোপ-আমেরিকার সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন ফিতনা, বাড়ছে ইসলাম ও জাহিলিয়াতের সংঘাত। সময়ের চাহিদা এবং জীবনের নিত্য-নতুন সমস্যা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া এবং একথা বলা যে, না, কিছু হচ্ছে না–এটা ভুল।

আজকের প্রয়োজন ও কর্মসূচি

মুসলমানদের একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং সঠিক পরামর্শ পরিষদের আজ অতীব প্রয়োজন। একদিকে আকীদার ব্যাপারে, উসূলের ব্যাপারে এবং শরীয়াতের নীতিমালা সম্পর্কে পাহাড়ের মতো অটুট থাকতে হবে। অন্যদিকে জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে পূর্ণ ধরণা, সম্যক অবগতি এবং ঋজু দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। এ দু'টি জিনিস হলে ইনশাআল্লাহ আমরা বর্তমান অবস্থা থেকে সহজেই উত্তরণ হতে পারব। বরং আমার দৃঢ় বিশ্বাস নেতৃত্বও আপনাদের পদচুম্বন করবে। মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা, নাগরিক ভাবনা এবং জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করা খুবই জরুরী। তারা যে মহল্লায় থাকবে সেখানে

তাদেরকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ধারক হিসেবে নজরে আসা বাঞ্চনীয়। তাদের দেখেই যেন লোকেরা অনুমান করতে পারে-এটা মুসলমানদের •মহল্লা মুসলমানদের ঘরে দীনের পূর্ণ বাস্তবায়ন ও প্রকৃত বাহিঃপ্রকাশ হওয়ার পাশাপাশি নাগরিক সচেতনতা, মানবতাবোধ, সত্যনিষ্ঠ, জনসচেতনতা, দেশাত্মবোধক ভাবনা, দেশরক্ষার পরিকল্পনা এবং দেশের সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার ভাবনা ইত্যাদি সবসময় চর্চিত হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য আপনি নিজে আদর্শ হোন, দুনিয়ার সামনে নিজেকে আদর্শরূপে পেশ করুন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতি মানবতার পয়গাম

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে দূরত্ব

ইংরেজি ভাষার একজন বড় কবি রুডিয়ার্ড কিপলিং বলেছিলেন 'প্রাচ্য প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পাশ্চাত্য, উভয়ে কখনও মিলতে পারবে না।' কথাটি যদিও একজন কবির মুখ থেকে বের হয়েছিল, কিন্তু মূলত এটি একটি ভাবনা। কখনও এমন হয় যে, কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি অথবা ভাবনা কোনো সোসাইটিতে বদ্ধমূল হয়ে যায়। মানুষের বিশ্বাস স্থাপন, প্রেরণা সৃষ্টি ও বিকাশের ক্ষেত্রে এর বড় হাত থাকে। এরপর যখন এই ধ্যান-ধারণা অথবা ভাবনাকে কোনো কবি, যিনি তার সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন, তার সাবলীল উপস্থাপনায় কাব্যিক স্টাইলে উপযুক্ত বাক্যে পেশ করেন, যা দৃষ্টান্ত হিসেবে খ্যাতি পায়। পরবর্তী প্রজন্ম এটা পুনরাবৃত্তি করে এবং একটি মূলনীতি ও নিয়ম হিসেবে এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে শুরু করে। কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের যত ক্ষতি সাধন করেছে এবং যেভাবে এটা মানুষের একক ভিত্তিকে টুকরো টুকরো করেছে, তার চিন্তায় যে কালো আবরণ দিয়েছে, আমি মনে করি না যে, এছাড়া আর কোনো চিন্তাধারা এই পরিমাণ ক্ষতি সাধন করতে পারে। কেননা এই দৃষ্টিভঙ্গিই মানব প্রজাতির বংশধারাকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য–দু'মেরুতে ভাগ করে দিয়েছে।

বলতে তো এটা একটি সাধারণ কথা অথবা ঐতিহাসিক বাস্তবতা–কিন্তু মানুষেরা এরপর থেকে সব সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে এই দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে যে, এটি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যাম্প। প্রথমত তো এ দুটি কখনো একত্র হতে পারবে না, আর যদি হয়ও তবে তা যুদ্ধের ময়দানে। যদি কখনো এ দুটির মধ্যে সংযোগ ঘটে তবে পরস্পরের দুর্ণাম রটাবে। খোঁজে খোঁজে অন্যের খারাপ দিকগুলো বের করে তা ব্যক্ত করতে সর্বদা চেষ্টায় থাকবে। শত শত বছর ধরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এই ধ্যান-ধারণাই চলে আসছে। কেউই পরস্পরকে বুঝার

চেষ্টা করেনি। আর যদি বুঝেও থাকে তবে তা প্রান্তিক অথবা অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের ভিত্তিতে, যা শুধু অপরের মন্দ দিকগুলোকেই তুলে ধরে। তাদের মধ্যে যে ভালো গুণাবলী আছে, শক্তি ও আলোর যে ফোয়ারা প্রবাহিত তা থেকে অধিকাংশেরই গাফলত প্রকাশ পায়। একজন অন্যজনকে যখন দেখে তখন সন্দেহ, ভয় এবং মন্দ ধারণার ভিত্তিতে দেখে অথবা ঘৃণা ও অপছন্দের দৃষ্টিতে তাকায়।

এই দূরত্বের প্রকৃত কারণ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বপ্রথম মোকাবিলা হয় ক্রুসেড যুদ্ধের সময়। ওই যুদ্ধের সময় যে বিশ্বাস প্রাচ্যের ওপর হামলা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, যে বোধ তাদের ভেতরে কাজ করছিল এবং তাদেরকে প্রাচ্যের প্রতি চরমভাবে উত্তেজিত করে তুলেছিল, এর ভিত ছিল ওই কিচ্ছা-কাহিনীর ওপর যা তারা মুসলমানদের ব্যাপারে শুনে আসছিল। তাদের মধ্যে এই চেতনা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, 'এ যুদ্ধ হচ্ছে পবিত্র ভূমিকে হিংস্র মূর্তিপূজার ছোবল থেকে মুক্ত করার জন্য।' এছাড়া যুদ্ধের বিভীষিকাময় ও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি কখনো কোনো যুদ্ধরত বাহিনীকে এ সুযোগ দেয় না যে, সে অন্য পক্ষের উত্তম গুণসমূহ ও সৌন্দর্য দেখে পরখ করবে, তাদের আকীদাসমূহ পাঠ করে তাদের মূল্যায়ন করবে এবং সততার ভিত্তিতে পারস্পরিক স্বার্থে কাজ করার পথ আবিষ্কার করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইতিহাসের গতিধারার বাস্তবতা হচ্ছে, ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ ফায়দা থেকে খালি নয় এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে যদি দূরত্ব পাওয়া না যেতো তাহলে বরং সমস্যার সৃষ্টি হতো।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পরস্পরে অতি কাছ থেকে পরিচয় ঘটেছে ওই সময় যখন উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থে তাদের শক্তিশালী হাত প্রাচ্যের দিকে বাড়িয়েছে এবং একের পর এক শক্তি প্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহের ওপর বিস্তার করেছে এবং নিজেদের সংস্কৃতি, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও কালচারের দ্বারা আক্রমণ করেছে। আর নিজেদের শাসনপদ্ধতির ভালো-মন্দ দু'দিক থেকেই এই প্রাচ্যকে গ্রাস করেছে–যারা সংস্কৃতি ও যুদ্ধপ্রযুক্তিতে অনেক পিছিয়ে ছিল। প্রাচ্য হামলার ভয়াবহতায় অনেক দিন পর্যন্ত এর সুযোগই পায়নি যে, পাশ্চাত্যকে একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে অথবা এর মৌল ও বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতা থেকে ফায়দা হাসিল করবে। আমাকে মাফ করবেন, আমি যদি এটাও বলে দিই যে, আরো একটি জিনিস যা প্রতিবন্ধক ছিল তা খোদ পশ্চিমা সংস্কৃতি–যা ওই সময় যৌবন ও লাবণ্যতার সর্বোচ্চ স্তরে ছিল। আর তার মধ্যে ওই সমস্ত বিষয় ছিল যা এমন সভ্যতায় পাওয়া যায় যেখানে দীনী উপকরণ দুর্বল বা অনুপস্থিত। আবার মাফ চেয়ে বলতে চাচ্ছি, এছাড়াও আরেকটি বিষয় যা প্রাচ্যের জন্য প্রতিবন্ধক প্রমাণিত হয়েছিল, তা ইউরোপের

শাসকগোষ্ঠীর হঠকারী কর্মপন্থা। যাতে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি, শাসনকর্তৃত্বের স্খলন এবং নিজে নিজেকে জন্মগতভাবে এ জাতির বিপরীতে বড় মনে করার ঔদ্ধত্য আচরণের দখল ছিল। যাদের হাত থেকে তারা শাসনের লাগাম ছিনিয়ে নিয়েছিল, যারা কাল পর্যন্ত ওই দেশের শাসনের অধীনে ছিল, যাদের অনুভূতি আঘাতপ্রাপ্ত এবং আবেগভঙ্গুর–এই আচরণ মানবিক মূল্যবোধের ওই চিন্তাধারার সঙ্গে কোনোভাবেই মিল খাচ্ছিল না পশ্চিমারা যার দাবিদার ছিল, আর এটা গণতান্ত্রিক ধারা অনুযায়ীও ছিল না, যাকে বিজয়ী এই জাতি এদেশে অনুপ্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারত।

এই দূরত্বের কিছু ক্ষতিকর পরিণতি

এর ফলে দুর্বল প্রাচ্যের মধ্যে অস্ত্র সমর্পণ (Surrender), বিজয়ী ও শক্তিশালী পশ্চিমাদের সামনে ঝুঁকে যাওয়া, তাদের মূলনীতি ও চিন্তাধারাকে প্রয়োজনের চেয়েও অধিক গুরুত্ব দেয়া, তাদের বাহ্যিক সংস্কৃতি ও জীবনপদ্ধতিকে সম্মান করা এবং তাদের অনুসরণ করার ঝোঁক সৃষ্টি হয়ে গেল। যাতে এই প্রাচ্য পশ্চিমাদের তল্পিবাহকে পরিণত হয় এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদেরকে অনুসরণযোগ্য আদর্শ মনে করতে থাকে। জীবনযাত্রায় যারা উচ্ছিষ্ট গ্রহণকারী, কাফেলার যারা পশ্চাতগমনকারী তাদের সারিতে এসে যায়। এসব বিষয় পাশ্চাত্যকে এমন সুযোগ দেয়নি যাতে তারা প্রাচ্যকে সাম্য ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবে। কিভাবে তাদেরকে ইজ্জত ও সম্মানের নজরে দেখবে, পথপ্রদর্শন ও দিশাদানের আশা করবে, অথবা তাদের থেকে সৃজনশীল কোনো কাজের প্রত্যাশা করবে–যখন প্রাচ্যই তাদের অস্তিত্ব পাশ্চাত্যের মধ্যে বিলীন করে দিয়েছে।

গোত্র ও বংশপ্রীতি

প্রাচ্যের জাতিসমূহে জাতিপ্রীতির প্রাবল্যের ওই দৃষ্টিভঙ্গি যাকে পাশ্চাত্য আকস্মিকভাবে একটি সহজ সমাধান হিসেবে কবুল করেছিল, যা তাদের মধ্যে একটি দীনী স্পৃহা পয়দা করেছিল, এরপর পাশ্চাত্যই এই দৃষ্টিভঙ্গির মন্দ দিকগুলো বুঝতে পারল এবং এটাকে প্রাচ্যের জন্য স্বাগতম বলল। যাক, জাতিগত এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচ্যের জাতিসমূহকে যারা আসমানী পয়গাম এবং বিশ্বব্যাপী দাওয়াতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল, এই সুযোগ দেয়নি যে, তারা পাশ্চাত্যের দিকে আরেকবার সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে পারে। আর এরপর মানবতার সাহায্যার্থে এভাবে অগ্রসর হতে পারত যেভাবে বিপদের সময় প্রথমেই অগ্রসর হয়; এবং মানবতাকে একটি নতুন জীবন, নতুন চিন্তাধারা এবং উপভোগ্য জীবনের জন্য নতুন ভিত্তিসমূহের সম্মিলন ঘটাতে

পারত। কিন্তু ওই জাতিসমূহ নিজেরাই আপন সত্তা, নিজের সমস্যা এবং জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে। নিজেরা নিজেদেরকে গোত্র, ভাষা ও ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ করে দিয়েছে। আর এভাবেই তারা শক্তি-সামর্থ্যময় জীবন, পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধতা এবং প্রাচীন ও প্রবাহমান ঝর্ণাধারা থেকে বেরিয়ে গেল, যা সারা দুনিয়ার জন্য ছিল আলোর মিনার এবং ইতিহাসের প্রত্যেক যুগে দীনী হিদায়াতের মাধ্যম।

প্রাচ্যবিদদের আন্দোলন

পাশ্চাত্যে এরপর প্রাচ্যবিদ এবং প্রাচ্য আন্দোলনের যুগ আসল। আশা করা হচ্ছিল যে, ওই লোকেরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে ন্যায়দণ্ডের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এবং এই বিশাল ও গভীর ফাটলকে ভরাট করবে, যা মানবতার দু'গোত্রের মাঝে বিরাজ করছে এবং ওই অগ্রাহ্যতাকে দূর করবে যাকে অজ্ঞতা ও গোঁড়ামী জন্ম দিয়েছে। আর তা প্রাচ্যের উৎকৃষ্ট সম্পদ অর্থাৎ রেসালতের শিক্ষা, নবীদের চারিত্রিক ভিত্তি, দীনী ব্যক্তিত্বের জীবনচরিত, এছাড়াও প্রাচ্যের শাহী উত্তরাধিকার, তাদের উৎপন্ন উত্তম পাথেয় এবং হতাশাব্যঞ্জক বিধিবদ্ধ কর্মকাণ্ড থেকে পরিবর্তন করতে পারবে। আর নিঃসন্দেহে এ ক্ষেত্রে তারা অনেক কিছুই করেছে। শত বছরের জমাকৃত পাণ্ডুলিপি যাতে সূর্যের কিরণ লাগেনি ওই প্রাচ্যবিদেরা এগুলোতে প্রাণের সঞ্চার করল। এগুলো পরিশুদ্ধ ও প্রচুর শ্রম ব্যয় করে মূলের সঙ্গে মিলিয়ে তা প্রকাশ করেছেন। এমনিভাবে এমন সব কিতাব সংকলন করেছেন যেগুলোর গুরুত্ব ও প্রয়োজন অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

আর কোনো ব্যক্তিই যার মধ্যে সামান্য পরিমাণ ইনসাফের গুণ ও ইলমের স্পৃহা আছে, এর ইলমী মানের কথা অস্বীকার করতে পারবে না। তারা এ ক্ষেত্রে যে কষ্ট স্বীকার করেছেন, নিজেদের প্রয়াসে যেটুকু আন্তরিক থেকেছেন এবং ইলমীপন্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে যে তীব্রতা ও গভীরতার পরিচয় দিয়েছেন তা কখনও ভুলার নয়। কিন্তু এর পাশাপাশি ঘটনা হচ্ছে, অনেক মুসলমানের অনুভূতি হলো তাদের মধ্যে অধিকাংশ প্রাচ্যবিদের ইলমীস্পৃহায় খেদমতের চেয়ে মাযহাবগত প্রাবল্য জোর পেয়েছে। এজন্য ইলমপিপাসু ও বাস্তবতাপ্রিয় শ্রেণী ওই বিষয়ের অপেক্ষায় ছিল যে, তারা হয়ত ধর্মীয় আবেগ এবং বিগত শতাব্দীর তিক্ত প্রভাব থেকে কিছুটা মুক্ত থাকবে। তাদের মধ্যে বস্তুনিষ্ঠতা, সত্যানুসন্ধান ও সত্যকে স্বীকার করার সৎ সাহস থাকবে। কিন্তু এই প্রাচ্যও তাদের মূল্যবান গুণাবলী ও অসংখ্য অবদান সত্ত্বেও এই বিভাজন দূর করতে সক্ষম হয়নি। আর এই পাশ্চাত্যকে যেখানে গবেষকদের কোনো কমতি নেই, ওই জিনিস দিতে পারেনি যা প্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে উদিত সাধারণত সফল ধর্ম, বিশেষত ইসলামের সত্য উদ্ভাসিত চিত্র। যার ব্যাপারে মুসলমানদের আকীদা হচ্ছে, এটি

সর্বশেষ আসমানী ও শাশ্বত একটি দীন। যার মধ্যে সমস্ত নবুওয়াতের শিক্ষা ও আসমানী হিদায়াত সর্বশেষ ও নতুন আঙ্গিকে বিদ্যমান। আর ওই যুগের সম্পূর্ণ উপযোগী যে যুগ সভ্যতাকে পিছনে নিয়ে যাওয়ার দাওয়াত দেয় না, যেমনটা অন্য অনেক ধর্মে রয়েছে। বরং ইসলাম ওই সভ্যতাকে সামনে বাড়ানোর প্রবক্তা ও প্রত্যাশী। আর ইসলাম চায় তাকে কট্টরপন্থা, নিস্পৃহতা এবং প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত করে নতুনরূপে ঢেলে সাজাবে, যা তার শক্তিতে এবং জীবন পরিচালনায় নতুন সোসাইটির প্রয়োজনের পুরোপুরি জিম্মাদার।

মোটকথা, উপকরণ যাই হোক না কেন, তবে প্রকৃত সত্য হচ্ছে পাশ্চাত্য এবং প্রতীচ্য নিজস্ব পয়গাম এবং নিজের ব্যক্তিসত্তায় স্বতন্ত্রবোধসম্পন্ন হবে। এতদুভয়ের যদি মুখোমুখি হয় তাহলে সন্দেহ, সংশয় ও হিংসা-বিদ্বেষের তুফানের মধ্যেই হবে। এ দুটি মেরু কখনও মানবতার সামষ্টিক উন্নতি এবং আদর্শিক সভ্যতার পুনর্গঠনে একত্রে মিলিত হবে না। মানবিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্রষ্টাপ্রদত্ত আভ্যন্তরীণ যোগ্যতা, প্রকৃতিগত গুণাবলী এবং জ্ঞান ও দর্শনের পশ্চাৎপদতা সত্ত্বেও যদি এ দুই মেরুর মাঝে লেনদেনের কোনো পর্যায় আসে তাহলে তা হবে নিতান্তই সীমিত গণ্ডিতে।

প্রাচ্যের স্বতন্ত্রতা

কুদরতী পরিবেশে পরিচালন হচ্ছে প্রাচ্যের কার্যক্রম। এর মূল ধাতুর উৎপত্তিস্থল মূলত ধর্মের সঙ্গে সংশিষ্ট। তাৎপর্য ও মহিমান্বিত নবুওয়াত পর্যায়ক্রমে তাকে পুনর্জীবিত করেছে। দীনী দাওয়াত এবং আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তিত্বরা এর খোরাকের যোগানদাতা। এর বিষয়বস্তু ও কর্মক্ষেত্র হচ্ছে মানুষের ধর্ম। সে মানুষের সম্পূর্ণ প্রতিবেশকে 'মানুষ গঠন' কার্যক্রমে লাগিয়েছে। এর জন্য তা নিজের প্রকৃতিগত যোগ্যতা ব্যয় করে নিজের মেধা ও ইচ্ছাশক্তিকে জীবিত রেখেছে। সে চেষ্টা করেছে মানুষ ওই গভীরতায় পৌঁছে যাক যার কোনো অতল নেই। এমন গোপন রহস্যের সন্ধান পাক যার কোনো শেষ প্রান্ত নেই। সে যেন তার সুপ্ত যোগ্যতার বিকাশ ঘটিয়ে এমন শক্তি সঞ্চয় করে যার মোকাবিলা করার মতো শক্তি দ্বিতীয়টি আর নেই। সর্বোপরি তার স্পৃহা ও আগ্রহকে এমন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যা দ্বারা চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন হয়। লক্ষে পৌঁছার মাধ্যম হিসেবে গণ্য হয়। যা ছাড়া সঠিক গন্তব্যে পৌঁছা আদৌ সম্ভব নয়।

নবুওয়াতের অঙ্কোরোদগমন

যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রাসূল বিশেষত সর্বশেষে আগত উম্মী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. দুনিয়াতে আগমনের মূল কর্মসূচি ছিল মানুষের তরবিয়ত। মানুষের ভেতরে নিহিত শক্তির ঝর্ণাধারাকে প্রবাহিত করা। লুকায়িত যোগ্যতার

অনুভূতি জাগ্রত করা। তাদের ওই অন্তর্চক্ষু খুলে দেয়া যার মাধ্যমে স্রষ্টা, এই জগতের একমাত্র মালিককে দেখতে সক্ষম হয়, এবং এর আলো ও উত্তাপ, জীবনের প্রতি ভালোবাসা, নির্ভরতা, দৃঢ়তা, আন্তরিক প্রশান্তি ও স্বস্তি অর্জন করতে পারে। আর যার দ্বারা এই দুনিয়াতে ওই জীবন, শক্তি ও শৃঙ্খলার প্রকৃত ঝর্ণাধারা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে এবং মারকাযের সন্ধান পাবে যার দ্বারা এ দুনিয়ার বিক্ষিপ্ত ইউনিটকে একীভূত করতে পারবে। তার জন্য গোটা দুনিয়া এমন এক ইউনিট হয়ে যাবে যার মধ্যে নেই কোনো বিচ্ছিন্নতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর না এই দুনিয়া ছোট ছোট স্বঘোষিত, লাগামহীন টুকরোয় বিভাজন হবে, যা পরস্পরে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ধারা চালু রাখে। বরং এই বিশ্ব পুরোটা একই শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যাকে এক শক্তিশালী ও দয়াবান সত্তা পরিচালিত করছে। যার কাছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নেই কোনো তফাৎ। ইরশাদ হয়েছে, 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। অতএব তাঁকেই গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে।'

মানবতার নতুন ভাবনা

এমনিভাবে মানুষ মূর্তিপূজা, কল্পকাহিনী, বানোয়াট উপাখান, কুসংস্কার ও কুপ্রথার সফল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। স্রষ্টা ও পালনকর্তা ব্যতীত কারো সামনে মাথা নত করার জিল্লতি থেকে নাজাত পায়। চাই তা পাথর হোক অথবা গাছ-গাছালী, সাগর হোক অথবা নদী, চাঁদ হোক অথবা সূর্য, ফেরেশতা হোক অথবা মানুষ, নারী হোক অথবা পুরুষ।

যে অন্তর্চক্ষু নবীরা খুলে দেন এর দ্বারা মানুষ যখন নিজের সত্তা ও কায়ার দিকে তাকায় তখন সে নিজেকে এ দুনিয়াতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে পায়। যার মধ্যে সর্বময় স্রষ্টা নিজের রূহ ঢেলে দিয়েছেন এবং তাকে নিজের আমানতস্থল ও ভেদরক্ষিত স্থান বানিয়েছেন। তাকে উত্তম উপযোগী অঙ্গ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে মর্যাদা দান করেছেন। দুনিয়ার নেতৃত্ব ও শৃঙ্খলা বিধানের জিম্মাদারী দিয়েছেন। ইমামত ও কর্তৃত্বের তাজ পরিয়েছেন। দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন তার জন্য, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন নিজের জন্য। ফেরেশতাদের দিয়ে তাদের সিজদা করানো হয়েছে। আর এজন্য হারাম করা হয়েছে তাদের জন্য কোনো মাখলুকের সামনে মাথা নত করাকে। ইরশাদ হয়েছে 'আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে।' (ত্বীন-৪)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে 'নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।' (বনী ইসরাইল-৭০)

এরপর যদি মানুষ নবুওয়াতের প্রদত্ত অন্তর্চক্ষু দ্বারা অন্যান্য মানুষ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ছড়ানো ছিটানো মানব বংশকে দেখে, তাহলে অভিন্ন বংশের বলে মনে হবে। যাদের অস্তিত্ব এক, যারা একই পিতার সন্তান। নবুওয়াতের শিক্ষার আলোকে তাকে আল্লাহর পরিবার বলে স্থির করা হয়েছে এবং এটা নিশ্চিত যে, তারা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় হিসেবে বিবেচিত হবে। যারা আল্লাহর পরিবার হিসেবে সবচেয়ে উপকারী ও কার্যকর হিসেবে পরিগণিত হবে, তারা যেমনিভাবে নিজের সত্তার ব্যাপারে অনুভূতিসম্পন্ন হবে তেমনিভাবে মানববংশের প্রতিটি সদস্যের জীবনের ব্যাপারে তাদের এ বোধ জন্ম নিবে। সুতরাং অভিন্ন এই বংশের মধ্যে বর্ণ-গোত্র, জাতীয়তা-দেশজ, ধনী-দারিদ্রের ভিত্তিতে বিভাজন জাহেলী যুগের পুনরাবৃত্তি। এই মানবতা নবী করীম সা. কে একদিকে রাতের অন্ধকারে, নির্জনে আল্লাহর সামনে এই বাক্যে সাক্ষ্য দিতে শুনেছে–'আমি সাক্ষী তোমার সব বান্দা ভাই ভাই' আর অন্যদিকে দিনের আলোতে বিশাল জনসমুদ্রে এই ঘোষণা দিতে শুনেছে 'হে লোকসকল! তোমরা সবাই আদম সন্তান। আর আদম আ. মাটি দ্বারা সৃষ্ট। আরবের অনারবের ওপর অথবা অনারবের আরবের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সাদার কালোর ওপর অথবা কালোর সাদার ওপর প্রাধান্য নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব শুধুই পরহেজগারী দ্বারা অর্জিত হয়।' পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে মানব! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি এবং গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।' (হুজুরাত-১)

নবীদের দাওয়াত ও কর্মপদ্ধতি

আম্বিয়ায়ে কেরাম তাদের স্ব স্ব যুগে, নিজস্ব দাওয়াতী পরিমণ্ডলে এবং সবশেষে উম্মী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. এই মানবতার প্রশিক্ষণের ওপর সমস্ত মনোযোগ প্রয়োগ করেছেন। আর এই প্রয়াস চালিয়েছেন যে, মানুষের স্বভাবজাত যোগ্যতা ও কর্মস্পৃহা যেন সতেজতা লাভ করে, যার কোনো দর্শন আজ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। এমনকি এর ধারে কাছেও পৌছতে পারেনি। অতঃপর এই যোগ্যতাসমূহ সংগঠিত করে তার ব্যক্তিগত ও গোটা মানবতার সংশোধন ও পরিশুদ্ধির দিকে যেন মোড় নেয়। মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করার বিস্ময়কর স্পন্দন সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। তার শক্তিতে আনুগত্যের স্পৃহা জাগ্রত করে দেয়া হয়েছে। খেদমতে খালককে তার কাছে পরম কাঙ্ক্ষনীয় করা হয়েছে। মানবাত্মাকে সন্তুষ্ট রাখা এবং এদেরকে সকল প্রকার বিপদাপদ

থেকে বাঁচিয়ে রাখা তাদের জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়া এবং নিজের সত্তাকে সুচারু ও তীক্ষ্ণভাবে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করার উৎসাহ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। ইখলাস ও আখলাকের ওই তীক্ষ্ণতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যেখানে বড় বড় জ্ঞানীদের মেধাও পৌছতে পারে না। যার ক্ষীপ্রতা জ্ঞানীদের জ্ঞানের পরিসীমার বাইরে, যার তীক্ষ্ণতা সাহিত্যানুভব ও কাব্যিক চেতনা থেকেও অধিক ক্রিয়াশীল। যাকে সীমাবদ্ধ কোনো চাহনী দ্বারা দেখা যাবে না, কোনো ক্যামেরা দ্বারা যার ছবি ধারণ করা যাবে না। মোটকথা, নবীদের শিক্ষা মানুষের মধ্যে অনুভূতির ক্ষীপ্রতা, রূহের স্বচ্ছতা, আখলাকের উচ্চতা, নফসের সম্মাননা, আত্মপছন্দ থেকে মুক্তি, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার প্রতি লোলুপ্ত বস্তুসমূহের প্রতি অনাসক্তি, ভাবনার সমৃদ্ধি এবং আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেছে। তাদের বিশ্বাসে যুগিয়েছে শক্তি, জাত ও সিফাতের ওই গভীর জ্ঞানে পরিপুষ্ট করেছে যা শুধু সে ব্যক্তিই অনুধাবন করতে পারে যারা এসব ব্যক্তিত্বের জীবনচরিত যথাযথ ও গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছেন। সারকথা হচ্ছে, নবুওয়াতের সবচেয়ে বড় অবদান মানবতা। এই মানবতাই নবী-রাসূলদের কর্মক্ষেত্র, তাদের চাষবাসের জায়গা। যেখান থেকে তাদের অঙ্কুরিত বীজ পরিণত হয়েছে বিশাল মহীরূহে।

শুধু উপকরণ যথেষ্ট নয়

প্রাচ্যে নবী-রাসূলেরা তাদের কর্মক্ষেত্র এই নির্ধারণ করেননি যে, তারা শুধু এই জগতের লুকায়িত শক্তির উদঘাটন করবে, তাকে কাবুতে আনবে, এর দ্বারা কাজ সিদ্ধ করবে। এ ধরনের উপকরণ তাদের কাছে মজুদ ছিল না। কিন্তু সৎ ইচ্ছা, ভালো নিয়ত এবং মহৎ উদ্দেশ্য মজুদ ছিল। প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কারিগরি বিষয়াদির যে সম্পর্ক আপনারা জানেন, এসব জিনিস সব সময়ই মানুষের অনুগত ও বশে রয়েছে। সুতরাং যখনই মানুষের ইচ্ছা হবে মহৎ, তার উদ্দেশ্য হবে স্বচ্ছ, তখন তারা সীমিত শক্তি ও সম্পদ, সাধারণ ও নগণ্য উপকরণ দিয়ে বড় বড় অবদান রাখতে সক্ষম হবে। যা ওই সময়ের উৎকর্ষমণ্ডিত সভ্যতা আঞ্জাম দিতে পারবে না। এই কিঞ্চিৎ সামর্থের দ্বারাই তারা ওই খেদমত করতে পারবেন যা উপায়-উপকরণসমৃদ্ধদের দ্বারাও সম্ভব নয়। কারণ যখনই কোনো কাজ আঞ্জাম দেয়ার দৃঢ় মনোবাসনা সৃষ্টি হবে, তখনই শক্তির আধার তাদের সামনে ভাসতে থাকবে, উপায়-উপকরণও প্রস্তুত হতে থাকবে, সমস্যা-সঙ্কটও বিদূরিত হয়ে যাবে। তখন এই সুদৃঢ় মনোবাঞ্ছা অটুট পাহাড় ও বিস্তৃত সমুদ্র মাড়িয়ে নিজের পথ বের করে নিবে। আর যদি সৎ নিয়ত ও দৃঢ় ইচ্ছাই অনুপস্থিত থাকে তাহলে উপায়-উপকরণ সব বেকার। যন্ত্রগুলো সব অসার। নিত্য নতুন সব উদ্ভাবন অচল।

ক্ষুধা ও পিপাসার তীব্রতা, মাতৃত্বের মমতা, ভালোবাসার আকুলতা এবং প্রেরণার দীপ্তি কোনোকালে কখনও অধিক জ্ঞান অথবা উপায়-উপকরণের মুখাপেক্ষি থাকেনি। প্রত্যেক কালে, প্রতিটি মুহূর্তে সে তার প্রয়োজন পূরণ করে নেয়। তার জানা আছে কিভাবে উদ্দেশ্য পূরণ করতে হয়। নবী-রাসূলেরা তাদের উন্নত কর্মপরিকল্পনা এবং সুষম ও সুবিন্যস্ত ভূমিকা দ্বারা মানুষের ভেতরে এমন এক প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার কারণে যে উত্তম আখলাক গ্রহণ এবং এটাকে নিজের জীবনের বানানোর জন্য এই পরিমাণ তাগিদ অনুভব করতে লাগল যেমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসাকাতর ব্যক্তি, সন্তানের বিরহে মমতাময়ী মা এবং ভালোবাসার সরোবরে হাবুডুবু খাওয়া প্রেমিক অনুভব করেন। ফল এই হয়েছে যে, তার পথ এমনিতেই সহজ হয়ে গেছে, উপায়-উপকরণ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই যোগান হয়েছে। যা ওই যুগের হিসেবে যথেষ্ট ছিল। আর এতে এমন এক সভ্যতার উৎপত্তি হয়েছে যাতে মানুষেরা পেয়েছে শান্তি, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও প্রশান্তির সর্বোচ্চ অংশ। সেই সভ্যতা নিঃসন্দেহে সীমিত ও সাদাসিধে ছিল। এতে ছিল না কোনো ঝঞ্ঝাট, মারপ্যাচের দর্শন। কিন্তু এতে ভবিষ্যতে নিরেট ও পরিশুদ্ধ ভিত্তির ওপর উৎকর্ষ সাধন এবং প্রশস্তি লাভের পুরো সুযোগ ছিল।

ইউরোপের পুনর্জাগরণ

এরপর পাশ্চাত্যের নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও পুনর্জাগরণের যুগ আসল। কিন্তু ওই সময় ধর্মগুরুদের দীর্ঘকালের ভুল প্রতিনিধিত্ব এবং অনৈতিক ধর্মীয় ইজারাদারীর কারণে আখলাক ও ধর্মের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। সম্পর্কের এই ক্ষীণতার ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক অবস্থা এবং ইউরোপের সীমিত গণ্ডিতে অস্তিত্বের টানাপোড়েনের কারণে পশ্চিমাদের দৃষ্টি মানুষের পরিবর্তে মানুষের প্রতিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার ওপর নিবদ্ধ হয়। তারা মানুষের সত্তা, রূহানী জগত ও আত্মার পরিসীমা ছেড়ে উপকরণ ব্যবস্থাপনায় নিজেদের সব মনোযোগ ব্যয় করে। তারা বস্তুতত্ত্ব, রসায়ন, শারীরিক বিদ্যা, প্রযুক্তি, ভূগোল এবং অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিজেদের সব যোগ্যতা কাজে লাগায়। এ ক্ষেত্রে তারা অর্জন করে অনস্বীকার্য সাফল্য। এটাও আল্লাহর একটি নেজাম, মানুষ যে জিনিস অন্বেষণ করে এবং এর জন্য নানাবিধ প্রয়াস চালায় সে জিনিস তার অর্জিত হয়ে যায় এবং তাকে সে কাবু করতে সক্ষম হয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে 'এবং মানুষ তাই পায়, যা সে করে, তার কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে। অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে।' (আন-নাজম : ৩৯-৪১) 'এদেরকে এবং ওদেরকে প্রত্যেককে আমি আপনার পালনকর্তার দান পৌঁছে দেই এবং আপনার পালনকর্তার দান অবধারিত।' (বনী ইসরাইল-২০)

ইউরোপের বস্তুগত উৎকর্ষ

সুতরাং পাশ্চাত্য বস্তুতত্ত্ব, শিল্প-বাণিজ্য, ভূগোল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় উৎকর্ষের শীর্ষশিখরে আরোহন করতে সক্ষম হয়েছে। আবিষ্কারের পর আবিষ্কারের নেশা তাদেরকে পেয়ে বসে এবং বিজয়ের পর বিজয় তারা করতে থাকে। এমনকি বর্তমানে তারা এমন উৎকর্ষ সাধন করেছে বিগত শতকে যা কল্পনাও করা যেতো না। এর ব্যাখ্যা কিংবা উদাহরণ পেশ করার কোনো প্রয়োজন আমি বোধ করি না। কারণ এদেশ নিঃসন্দেহে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সফল পৃষ্ঠপোষক। পশ্চিমা সভ্যতার এটা মূল কেন্দ্রস্থল, রাজধানী। খোদ এই বিশাল জ্ঞাননিকেতন (লন্ডন ইউনিভার্সিটি) যেখানে আমার এই বক্তব্য উপস্থাপনের সৌভাগ্য অর্জন হয়েছে, এই সভ্যতার বিনির্মাণে ও উৎকর্ষ সাধনে অপরাপর সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠান ওই উপকরণ যোগান দিচ্ছে যার বাহ্যিক অবয়ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ময়দানে নজরে ভাসে। সুতরাং এ বিষয়ে অধিক বিশ্লেষণ বাহুল্য ও সময় অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

নিঃসন্দেহে এই উপায়-উপকরণ যোগান হয়ে গেছে। আর এটা আল্লাহ তাআলার বিশেষ নিয়ামত, যার অবমূল্যায়ন করা যাবে না। এসব উপায়-উপকরণের সুবিশাল এক ভাণ্ডার আজ চোখের সামনে। এগুলোর অস্তিত্বের উদ্দেশ্য সবার সামনে পরিষ্কার–মানুষের জীবন-যাপনের স্বাচ্ছন্দ ও প্রশস্তি, যা আজ অর্জিত হয়েছে। তবে এর চেয়ে অনেক কম জিনিসের দ্বারাও মানবতার সুখ-সমৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে। এর চেয়ে অনেক স্বল্প উপায়-উপকরণ দ্বারাও মানুষেরা নির্বিঘ্ন সুখী জীবন-যাপন করতে পারে। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তাও অর্জিত হতে পারে। আর এটাও সম্ভব ছিল যে, এর দ্বারা ভালোবাসা ও দরদের একটা পরিবেশ দুনিয়াতে কায়েম হয়ে যেতো। লোকেরা পরস্পরে বুঝত ও সাহায্য-সহযোগিতা করত। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত মানববংশের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা পরস্পরের মাঝে গড়ে ওঠা অদৃশ্য কৃত্রিম দেয়াল ভেঙ্গে ফেলতে পারত।

বর্তমানে মানুষ দুনিয়ার এক প্রান্তে বসবাস করে অন্য প্রান্তের কোনো লোকের সাহায্য করতে পারে, তার অন্তরের স্পন্দন অনুভব করতে পারে, তার চেহারা দর্শন করতে পারে। জালেমদের জুলুম থেকে রুখতে পারে, আর মজলুমকে করতে পারে সাহায্য। কোনো বিপদগ্রস্ত মানুষের ডাক শুনে ছুটে যেতে পারে এবং নাঙ্গা-ভুখা মানুষের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে পারে। কারণ অজ্ঞতা ও মানুষের দুর্বলতার কারণে যে সীমাবদ্ধতা ছিল তা খতম হয়ে গেছে। পূর্ববর্তীরা যার অভাব-অনুযোগ করতে পারত, বর্তমানে সেই সব উপায়-উপকরণ হাতের নাগালে, যার দ্বারা মানুষ নিমিষেই নিজেদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে পারে।

বর্তমানে তো সৎকর্মশীলদের জন্য কোনো ওজর অবশিষ্ট নেই। মানবতার কাণ্ডারী, শান্তি ও নিরাপত্তার ধ্বজাধারীরা আজ কোন জিনিসটির স্বল্পতা ও সীমাবদ্ধতার অভিযোগ করতে পারবে–হোক না তা যে কোনো ব্যক্তি, রাষ্ট্র কিংবা সমাজ।

উপকরণের ব্যর্থতা

এই উপায়-উপকরণগুলো তো ওই কাজের জন্য সম্পূর্ণ যথেষ্ট ছিল যে, বিপদ ও সঙ্কটের ঘূর্ণাবর্ত থেকে মুক্ত করে মানুষের এই পৃথিবীকে দুনিয়ার জান্নাতে রূপান্তর করে দিবে, যেখানে থাকবে না কোনো সমস্যার ঝঞ্ঝাট, ভবিষ্যতের ভয় ও অতীতের চিন্তা, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও দেলের দ্বিধা-সঙ্কোচ এবং দারিদ্র ও অসুস্থতার ভয়। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি এর কোনো একটি মানবিক উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে? দুনিয়ার শঙ্কা ও সঙ্কোচের অস্তিত্ব কি মিটে গেছে? দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তা কি নিশ্চিত হয়েছে? মানুষের মধ্যে কি নির্ভরতা এসে গেছে? যুদ্ধের ভয়াবহ ছায়া কি চিরদিনের জন্য দূর হয়ে গেছে? এর 'অবাধ্য ভূত' কি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে? আমার এটার প্রয়োজন নেই যে, আপনাদের থেকে এ প্রশ্নগুলোর উত্তরের অপেক্ষা করব। কারণ এই বৃহৎ শহর (লন্ডন) দুই দুইটি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা স্বচক্ষে দেখেছে এবং এর অশুভ পরিণতির নির্মম শিকার হয়েছে। বর্তমানে আমরা আনবিক যুগ অতিক্রম করছি। এদেশের জ্ঞানী ও লেখকেরা এমন সব কিতাব দ্বারা বিশাল এক লাইব্রেরি গড়ে তুলেছে যাতে বর্তমান সভ্যতার আহুত বিপদাপদের চিত্র অংকন করা হয়েছে অত্যন্ত নিপুণভাবে। নৈতিকবোধসম্পন্ন বংশসমূহের উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও সংশয় ব্যাপক হয়ে যাওয়া, ভয় ও হতাশায় ছেয়ে যাওয়া লেখকদের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এসব লোক যা কিছু লিখেছে এবং লিখছে সবই স্বস্থানে সম্পূর্ণ সঠিক, অনেক দলীল-প্রমাণসমৃদ্ধ।

ভুল হচ্ছে কোথায়?

এত উপায়-উপকরণ সত্ত্বেও এই ফলাফল আসছে কেন? অথচ উপায়-উপকরণ সব নির্বাক, বধির, এগুলোর কোনো ইচ্ছাশক্তি নেই। এগুলো তো খেদমতে খালক এবং উপকার পৌছানোর কাজে ব্যবহারের জন্য সব সময় প্রস্তুত। এ প্রশ্নের জবাব গোপন কোনো রহস্যের উন্মোচন নয়। এতে অসাধারণ কোনো মেধা ও চিন্তাশক্তি ব্যয় করারও কোনো প্রয়োজন নেই। সাদাসিধে কথা হলো, মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান যে পরিমাণে উৎকর্ষ সাধন করেছে স্বয়ং মানুষ সে পরিমাণ উন্নতি সাধন করতে পারেনি। উপকরণ এবং প্রতিষ্ঠান তো বেশ উন্নতি করেছে কিন্তু মানুষের বাসনা এবং তাদের ইচ্ছায় ইতিবাচক কোনো উন্নয়ন সাধিত হয়নি। বরং এটা বলা যেতে পারে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান আখলাক ও

মানুষের হক খর্ব করে উৎকর্ষের ধাপ অতিক্রম করেছে, কলব ও রূহের হক মেরে কল-কারখানাগুলো উন্নতি লাভ করেছে।

আজ মানবতার মগজ জীবিত কিন্তু অন্তর মৃত

এর কারণ হলো, অত্যন্ত আফসোসের সঙ্গে বলতে হয় যে, পাশ্চাত্য তাদের সকল তৎপরতা, বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম এবং কর্মের গণ্ডি নিরূপণ করেছেন মানুষের বাইরের দুনিয়াকে। আর এই বাইরের জড়তে তারা তাদের সকল শ্রম ও সাধনা ব্যয় করেছে এবং মানুষের দৃষ্টিকে এদিকে ফিরিয়ে নিচ্ছে। মানুষ যারা এই দুনিয়ার সুরভিত পাপড়ি, জগতের অস্তিত্বের কারণ এবং মহান স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টি; তারাই এই উৎকর্ষ থেকে বঞ্চিত। যদি বস্তুতত্ত্ব, রসায়ন ও শারীরিক বিদ্যা কখনও এর প্রতি নজর দিয়েও থাকে তবে তা অত্যন্ত সীমিত আকারে বস্তুগত ধ্যান-ধারণায়। যা মানুষের ভেতর পর্যন্ত পৌছতে চেষ্টা করেনি এবং তার প্রকৃতিকে বুঝার প্রয়োজন বোধ করেনি। তার অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ যেমন ঈমান, আকীদা ও আখলাককে সুসজ্জিত করার বিষয়ে কখনো ভাবেনি।

মানবতার তালা শুধু ঈমানের চাবি দ্বারাই খোলে

এই বিষয়পারদর্শীদের হাতে এমন জগত আসেনি যেখানে মানুষের দিক পরিবর্তন করে সঠিক করে দিবে। ফিতনা-ফাসাদ থেকে ফিরিয়ে ভালোর দিকে আসক্ত করবে। সেই জগৎ হলো 'কলব'–যখন সেটা ঠিক হয়ে যাবে মানুষও ঠিক হয়ে যাবে। যদি তা বিকৃত হয় তবে পুরো মানুষই বিকৃত হয়ে যাবে। কিন্তু শত আফসোস! পশ্চিমা বিশ্ব যদি চায়ও তবু এই অন্তরের জগতের সন্ধান পাবে না। তা থেকে উপকৃত হওয়া এবং মানবতাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা তো অনেক দূরের কথা। কেননা প্রত্যেক তালা ওই চাবি দ্বারাই খুলে যা এর জন্য বানানো হয়েছে। এই অন্তরজগতের একটি তালা আছে যার চাবি এই বিশাল কারখানা কিংবা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা তৈরি করা যায় না। দুনিয়ার বড় বড় বিজ্ঞানী যা বানাতে পারে না। এই আবদ্ধ তালার বিকল্প চাবি যেমন বানাতে পারে না তেমনি পারে না ভেঙ্গে ফেলতে। কারণ এটা মানবতার তালা–গোডাউন কিংবা কারখানার তালা নয়। এটা শুধু ঈমানের চাবি দ্বারাই খুলতে পারে। যা ছিল শুধু নবুওয়াতেরই তোহফা। কিন্তু তা আজ হারিয়ে গেছে। নতুন সভ্যতার সুদৃঢ় প্রাচীর এবং ইবাদতখানার খুঁটির নিচে কোথাও হয়ত এ চাবি তলিয়ে আছে।

প্রকৃত নষ্টামী কোথায় ?

মানবতার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যের পৃথক হয়ে যাওয়ার দ্বারা। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ঈমান থেকে পৃথক করে দেয়ার মধ্যে। কলকারখানার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সদিচ্ছার অনুপস্থিতির মধ্যে। এই পৃথকতা ও দূরত্ব আমাদের

সভ্যতাকে নানা ধরনের বিপদে পতিত করেছে। প্রাচ্যে ঈমানের ঝিলিক বাড়তে থাকল এবং তা উৎকর্ষমণ্ডিত হলো, আর অন্যদিকে পাশ্চাত্যে বাড়তে থাকল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং তা দিন দিন সাফল্যমণ্ডিত হলো। ঈমানের জন্য ইলমের সান্নিধ্য প্রয়োজন আর ইলমের জন্য ঈমানের তত্ত্বাবধান ও নেগরানী আবশ্যক। আর মানবতা উভয়টির সান্নিধ্য ও সহযোগিতার প্রত্যাশী। যেন নির্মিত হয় নতুন এক সোসাইটি, যাত্রা করে নতুন এক প্রজন্ম। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার প্রত্যাশা শুধু এ দুই সৌভাগ্যের মিলনেই করা সম্ভব।

প্রাচ্যের সওগাত

প্রাচ্যের সম্পদ ওই পেট্রোল নয় যাকে লোকেরা 'কালো সোনা' বলে আখ্যায়িত করে, যা আপনারা বড় বড় শহরে রফতানি করেন। যা দ্বারা উড়োজাহাজ ও মটরযান চলাচল করে। প্রাচ্যের উপঢৌকন ও দান হলো তাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ ঈমান–যার একটি অংশ আপনারা খৃষ্টশতকের সূচনাপর্বে লাভ করেছিলেন। এরপর ঈসায়ী ক্যালেন্ডারের হিসাব অনুযায়ী ৬ষ্ঠ শতকে এর ঝর্ণাধারায় যে জোয়ারের সৃষ্টি হয় তার কোনো নজীর ইতিহাসে রক্ষিত নেই। সেই ঝর্ণাধারা আরব উপদ্বীপের দূরপ্রান্ত থেকে উৎপত্তি–যা পরবর্তী সময়ে গোটা দুনিয়াকে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে। কবির ভাষায় 'তা থেকে বঞ্চিত থাকেনি দুনিয়ার কোনো মাটি-পানি-বাতাস, এতেই হয়েছে খোদার জমি সব আবাদ।'

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরও আপনাদের জন্য অতি সহজ। শর্ত শুধু একটাই নিষ্কলুষ চরিত্র ও দৃঢ় ইচ্ছা। সভ্যতার জন্য ক্ষতিকারক সমস্যাসমূহ দূর করার পূর্ণ যোগ্যতা তারা আজও রাখেন। ওই ঝর্ণাধারায় আজও সে শক্তি বিদ্যমান যা দ্বারা অপরিমেয় শক্তির আধার স্বচ্ছন্নময় জীবনে এক নতুন প্রবাহের সৃষ্টি করা, যাতে মানবিক সাফল্য ও উৎকর্ষের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। আর অস্তিত্ব লাভ করে নতুন এক সোসাইটি। এই মহান কাজের জিম্মাদারী বর্তিত হয় আপনাদেরই কাঁধে, কারণ আপনারাই হলেন ওই সভ্যতার সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। একটি সময় পর্যন্ত প্রাচ্যে এ পয়গামের ধারক মজুদ ছিল। বর্তমানে আপনাদের মধ্যেও ওই বিশাল শক্তি ও জীবন লুকায়িত আছে যার দ্বারা আপনারা সূচনা করতে পারেন এক নতুন যুগের, ইতিহাসকে পরিচালিত করতে পারেন নতুন পথে। কুরআন মজীদ আজও আপনাদেরকে আহবান জানাচ্ছে 'নিশ্চয় তা আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত–এটি নূর ও প্রকাশ্য কিতাব।'

মজলুম মানবতা!

চোখের কাঁটা

হিন্দুস্তানের প্রাচীন কিচ্ছা-কাহিনীর ভেতরেও অনেক সূক্ষ্ম ও শিক্ষণীয় বিষয় লুকিয়ে। মনে হয় এখানকার জ্ঞানীরা এসব কাহিনীর মধ্যে জীবনের বাস্তবতা ও নিগূঢ় রহস্যের তরজমা করেছেন অত্যন্ত নিপুণভাবে। তারা নীরস বাস্তবতাকে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে মেশানোর চেষ্টা করেছেন। আমি এসব ছোট ছোট কাহিনীর সাহায্যে জীবনের অনেক বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি।

শৈশবে আমি যে ঘটনা শুনেছিলাম এবং মস্তিষ্কের করোটিতে কোথাও লুকিয়ে ছিল সেগুলোর মধ্যে একটি ঘটনা ছিল যাতে কোনো এক মজলুম মহিলার দাস্তান অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে বয়ান করা হয়েছে। ঘটনাটি মোটামুটি এ রকম–ওই মহিলার সারা শরীরে কেউ কাঁটা বিঁধিয়ে দিত। তার সতীন দিনভর তার গায়ের কাঁটা খুলত। কিন্তু ইচ্ছে করেই চোখের কাঁটা খুলত না। এভাবেই রাত হয়ে যেতো। পরদিন আবার নতুন করে সারা শরীরে কাঁটা বিঁধে দেয়া হতো। সতীনও যথারীতি শরীরের কাঁটাগুলো খুলে দিত। কিন্তু চোখের কাঁটা খুলত না।' ঘটনার এ অংশটুকুই আলোচনা করা উদ্দেশ্য। আপনি চিন্তা করলে দেখতে পাবেন, দীর্ঘকাল থেকে মজলুম মানবতার সঙ্গে এ ধরনের আচরণ করা হচ্ছে। তাদের সারা শরীর কাঁটাবিদ্ধ। জালেমেরা কাঁটা দ্বারা তাদের শরীর ভরে রেখেছে। কিছু কিছু সমব্যথী ও সহমর্মীর হাত তাদের গা থেকে কাঁটা খোলার জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তারা সব সময়ই চোখের কাঁটাটি রেখে দেয়। এভাবে তাদের মুক্তির পর্বটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ফলে পরবর্তী দিন তাদেরকে তেমনই আহত ও আক্রান্ত পাওয়া যায়। আবার প্রথম থেকে শুরু হয় পরিত্রাণদানের প্রয়াস।

মানবতার কাঁটা

মানবতা একটি পূর্ণাঙ্গ মানব বডি এবং অস্তিত্বের প্রতিনিধি, যা মানব জীবনের সব শাখারই পূর্ণাঙ্গ রূপ। এর মধ্যে শরীর, পেট, অন্তর, মস্তিষ্ক, আত্মা সবই আছে। এসব অংশের সঙ্গে কিছু বিপদাপদও আছে। সেগুলোই হলো তার শরীরের কাঁটা যা তাকে ক্ষত-বিক্ষত করছে।

ক্ষুধা-অনাহার এবং ভালো ও সহায়ক খাবার না পাওয়া পেটের কাটা। অবশ্যই এর দ্বারা মানুষের কষ্ট হয়। বিশ্ব মানবতার জন্য এটা বড়ই দুর্ভাগ্যের এবং জীবনের সবচেয়ে বড় লজ্জাস্কর দিক যে, স্রষ্টার অফুরন্ত খাদ্যভাণ্ডার ও ব্যবস্থাপনা মজুদ থাকার পরও মানুষের কিছু অবৈধ হস্তক্ষেপ অথবা কোনো সাম্রাজ্যবাদের খামখেয়ালী কর্মপদ্ধতির কারণে মানবতার একটি বড় অংশ পেটপুড়ে খেতে পায় না। এমনকি তারা বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম উপকরণ ও মৌলিক প্রয়োজন থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত হয়। এর জন্য চিন্তা-ভাবনা করা, রাগতভাবে জোর-জবরদস্তির পথ অবলম্বন এবং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার ও জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ কুদরতী নির্দেশ এবং সুস্থ মানবিক অনুভূতির পরিচায়ক। এতে বিস্মিত হওয়া অথবা এর জন্য তিরস্কার করার কোনো অবকাশ নেই।

মানুষ শরীরসর্বস্ব এবং শরীরের ঠাণ্ডা-গরমের অনুভূতি তার মধ্যে রয়েছে। পোশাকের প্রয়োজনও তারা বোধ করে। এ চাহিদা পূরণ করার জন্য জমিনের ওপর পুরো ইনসাফ এবং প্রয়োজন মোতাবেক বস্ত্র উৎপাদক জিনিস এবং পোশাক তৈরিকারক হাত সৃষ্টি করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও অন্যায্য বিষয় হলো, কিছু মানুষের অতিরিক্ত পোশাক ব্যবহার, অপ্রয়োজনীয় সংরক্ষণ অথবা নিষ্প্রাণ দেয়ালে প্রাণময় মানুষের ব্যবহারযোগ্য প্রয়োজনীয় কাপড় পরিয়ে দেয়ার কারণে মানুষ ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায় অথবা নিজের সম্ভ্রম ঢাকার জন্য প্রয়োজন পরিমাণ বস্ত্রটুকু পর্যন্ত তার কাছে মজুদ থাকে না।

মানুষের একটা অন্তর আছে। এর কিছু বৈধ চাহিদা রয়েছে। তা পূরণ না করা বড়ই বাড়াবাড়ি ও অবিচার। মানুষ আবার মস্তিষ্কধারীও। সেই মস্তিষ্ক ইলম থেকে মাহরূম হওয়া, উন্নতি ও বিশুদ্ধ চিন্তাশক্তি থেকে দূরে থাকা ইনসাফ ও নেজামে জিন্দেগীর বড় ত্রুটি। আর এ ত্রুটি দূর করা একজন অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ এবং সুস্থ বিবেকধারী জামাতের ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব।

মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং মানুষের রূহানী মস্তিষ্কপ্রসূত ও শারীরিক শক্তির ভারসাম্যপূর্ণ একটি উৎকর্ষ হাসিল করার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সুযোগ যখন অর্জিত হয়, এর পথে যখন কোনো শক্তিশালী প্রতিবন্ধক না এসে যায় তখন সাধারণত দেখা যায় ভিনদেশী শাসন জীবনপ্রক্রিয়ায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে বসে। আর এর বিভক্তির কাজটি নিজের অসহমর্মিতা ও অন্যায্য হাতে নিয়ে নেয়। তখন তাদের শাসনাধীন জাতির বৈধ জযবাও নস্যাৎ হয়ে যায়। তাদের মেধার স্রোতধারা শুকিয়ে যায়। ফলে নিজদেশেই তারা বাস করতে থাকে কারারুদ্ধ কয়েদীর মতো। এজন্য দাসত্বও মানবতার জন্য এক বিশাল মসিবত ও প্রাণঘাতি। আর তা দূর করা জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা থেকে উপকৃত হওয়ার পূর্ব শর্ত।

আভ্যন্তরীণ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েন

এজন্য নিঃসন্দেহে অনাহার, বস্ত্রহীনতা, শিক্ষা বঞ্চিত হওয়া এবং দাসত্ব ওই সূই বা কাঁটা যা মানবতার শরীরকে বরবাদ করে দেয়। এসব দূর করা মানবতার এক বিশাল খেদমত। কিন্তু মানবতার সকল দুঃখ-দুর্দশা কি কাঁটাই? শুধু এই কি তাদের শরীরের কাটা? এ কাটাগুলো বের করে দিলেই কি তাদের আন্তরিক প্রশান্তি, শারীরিক আরাম এবং স্বস্তির নিদ্রা নসীব হয়ে যাবে? তার চোখের খসখস এবং অন্তরের দুহুরমুহুর দূর হয়ে যাবে? আমরা দেখি মানুষের মসিবত শুধুই এর দ্বারা দূর হয়ে যায় না যে, সে পেটপুড়ে খেতে পায়, প্রয়োজন অনুপাতে বস্ত্রের যোগান পায়, চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ করতে পারে ইচ্ছে মতো এবং শিক্ষা হাসিলের সুযোগ তার নাগালে থাকে। তার শরীরে আরো কিছু বিষাক্ত কাটা ঢুকে আছে, যাতে সে থেকে থেকে ব্যথায় মুষরে উঠছে। মানব সমাজের এমন অংশ যাদের জীবন ধারণের মতো প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ হয়েছে, তারাও গভীরে বিদ্ধ এই বিষাক্ত কাঁটার আঘাতে প্রতি মুহূর্তে তপড়াচ্ছে এবং ভেতরে ভেতরে কাতর হয়ে পড়ছে।

লোভ ও লালসা

মানুষ এতেই সন্তুষ্ট থাকে না যে সে নিজে খেতে পায় এবং তার পরিবার-পরিজন নিয়ে স্বাচ্ছন্দে চলতে পারে। কারণ তার মধ্যে প্রাকৃতিক এই পেট ছাড়াও কৃত্রিম এক বিশাল পেট রয়েছে। আর তা হালো, লোভ ও লালসার পেট, যা জাহান্নামের মতো শুধুই 'আরো চাই' বলে চিৎকার করছে। নিছক প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ হাসিলের জন্যই তারা টাকা-পয়সার প্রতি লালায়িত হয় না, বরং উদ্দেশ্যহীনভাবেই এর প্রতি একটা নিখাত ভালোবাসা ও টান তারা অনুভব করে। বড় থেকে বড় কোনো অংকও তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। সম্পদের প্রতি খাপহীন এই মহব্বতের ফলে তারা যেকোনো ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যায় বিনা দ্বিধায়। উৎকোচ গ্রহণ, চোরাকারবার, মুনাফাখোরী ইত্যাদি তাদের মেজাজ ও প্রকৃতির অতি স্বাভাবিক কারিশমা।

অসৎপন্থা অবলম্বনের মৌলিক কারণ

দুনিয়ার নৈতিক ইতিহাস যদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করা হয় এবং গোড়ামীমুক্ত হয়ে যদি অসৎ পন্থা, অশুভ আচরণ ও খাপছাড়া শহুরে জীবনের সমস্যার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা হয় তবে ইতিহাসের ভাণ্ডারে মানবিক চাহিদা ও প্রকৃত

প্রয়োজনের হাত খুব বেশি প্রসারিত পাওয়া যাবে না। বরং অবৈধ চাহিদা এবং ধার করা প্রয়োজনই বেশি নজরে ভাসবে। এই অবৈধ প্রবৃত্তি ও ধারকৃত প্রয়োজন প্রত্যেক যুগে শহুরে জীবনে নতুন নতুন সমস্যা এবং প্রত্যেক শাসনব্যবস্থার জন্য নতুন নতুন সংকটের সৃষ্টি করেছে। ধার করা এই প্রয়োজনই লোকদেরকে অন্যায্য হস্তক্ষেপ, জবরদখল, উৎকোচভোগ, চিটিংবাজি, মুনাফাখোরী এবং নানা ধরনের অবৈধ কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ করেছে। এর প্রভাবে পুরো দেশ এবং বড় বড় রাজত্ব পর্যন্ত ধ্বংস ও বিস্মৃতির অতরে তলিয়ে গেছে।

আজও যদি বর্তমান সমস্যা ও সঙ্কট নিয়ে গবেষণা করা হয় তবে স্পষ্ট নজরে ভাসবে আজকের পেরেশানী ও অস্বস্থির কারণ এই নয় যে, দেশের নাগরিকদের বড় একটি অংশ নিজেদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারছে না এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রের প্রকট চরমে। ইনসাফের দৃষ্টিতে যদি দেখা হয় তবে দেখা যাবে ভুখা-নাঙ্গার কারণে কারো প্রশান্তিতে কোনো ভাটা পড়েনি। প্রশান্তি ওই লোকদের জীবনে অনুপস্থিত যাদের পেট ভরপুর। কিন্তু তাদের অন্তর কখনও সম্পদে ভরে না, বাস্তব প্রয়োজনের শুধুই বদনাম। মানুষের মৌলিক চাহিদার ফিরিস্তি খুব একটা দীর্ঘ নয়, সব সমস্যার সৃষ্টি করেছে কৃত্রিম ও ধার করা প্রয়োজন। যার তালিকা দিন দিন শুধুই দীর্ঘ হয়। আর কখনও এই পরিমাণ বেড়ে যায় যে, পুরো মহল্লা এবং কখনো পুরো শহরের সম্পদ একজন মাত্র ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হয় না।

প্রশান্তির অনুপস্থিতি ও এর কারণ

আজকের এই অশান্ত পরিবেশ, উপকরণের স্বল্পতা এবং অস্থিতিশীল অবস্থা কেন? এর কারণ কি দেশের বেশির ভাগ লোক ভুখা-নাঙ্গা? এটা স্পষ্ট যে, এর একমাত্র কারণ হলো মানুষের মধ্যে সম্পদের স্পৃহা বেড়ে গেছে। রাতারাতি সম্পদশালী হয়ে যাওয়ার সাধ ও প্রেরণা তাদেরকে উন্মাদ করে দিচ্ছে। সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবন তাদের থেকে বিদায় নিয়েছে। দম্ভ-অহংকার, প্রদর্শনস্পৃহা, স্তুতিপ্রিয়তা এসবের আবরণে তারা ঢাকা পড়ে গেছে।

জীবনের আযাব

আজ যে জিনিস জীবনকে আযাব এবং দুনিয়াকে আযাবের ঘর বানিয়ে রেখেছে তা হলো ক্রমবর্ধমান উৎকোচপ্রবণতা, চোরাকারবারী এবং অবৈধ মুনাফাখোরী। এই শাস্তির জন্য কি ক্ষুধা, দারিদ্র ও বস্ত্রহীনতাকে দায়ী করা যাবে? মূলত যাদের খোরাকীর চেয়ে অধিক খাদ্যভাণ্ডার, প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্ত্র এবং চাহিদার চেয়ে অধিক সম্পদ রয়েছে তাদের কর্মকাণ্ডই এর জন্য দায়ী। হাজারো অপরাধীর মধ্যে একজনও ক্ষুধাতাড়িত ও শীতপীড়িত পাবেন না। এসব হচ্ছে মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর কাজ। যাদের কাছে প্রয়োজনীয়

জীবনোপকরণের কোনো কমতি নেই এবং অপরাধে জড়িয়ে পড়ার মতো বাধ্যবাধকতামূলক কোনো পরিস্থিতির শিকারও তারা নয়।

বস্তুত মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের বিষয়টি সমস্যার কিছু নয়। দেশের প্রতিটি নাগরিকের অন্ন-বাসস্থান এবং তার মৌলিক প্রয়োজনাদি পূরণ করা খুবই সম্ভব। কিন্তু দুনিয়ার সর্ববৃহৎ কোনো রাজত্ব, সর্বোৎকৃষ্ট কোনো শাসনব্যবস্থাও কি সীমিত জনগোষ্ঠীর ছোট্ট কোনো আবাদীর ধারকৃত প্রয়োজন ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে? কৃত্রিম সেই পেট কি কেউ ভরতে পারবে যার মিথ্যা ক্ষুধা (কুপ্রবৃত্তির তাড়না) সমস্ত মানুষের রিযিক খেয়েও মিটে না? সুতরাং বিষয়টি যেহেতু বাস্তব প্রয়োজনের নয় বরং উচ্চবিলাস ও প্রবৃত্তির তাড়নায় এজন্য এমন জীবিকাদর্শন অথবা অর্থব্যবস্থা যা সমাজের মানসিকতা পরিবর্তন করে না, নিছক মানুষের পেট ভরা ও পিট ঢাকার দায়িত্ব নেয়, যা বস্তুগত ভাবধারায় ভারসাম্য সৃষ্টির পরিবর্তে তা উস্কে দেয়; তা কি কোনো সমাজকে আভ্যন্তরীণভাবে প্রশান্ত করতে পারে এবং জীবনকে চলমান সংকট থেকে নাজাত দিতে পারে?

জীবনের সমস্যাসঙ্কুলতা ও এর কারণ

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে উৎকোচপ্রবণতা, চোরাকারবার, অবৈধ মুনাফাখোরী এবং চারিত্রিক বিচ্যুতি প্রকৃত সমস্যা নয়। প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে ওই মানসিকতা ও প্রবৃত্তি যা এসব অনৈতিক ও অসংলগ্ন কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। যতদিন এই মেজাজে পরিবর্তন না আসবে ততদিন এ সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। যদি একটি দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় তবে দশটি দরজা খুলে যাবে। মানবমস্তিষ্ক নিজের প্রবৃত্তি পূরণের জন্য অনেক চোরা দরজা বানিয়ে রেখেছে। যদি এসব চোরা দরজা বন্ধ না করা হয় তবে পথরুদ্ধ করে কোনো লাভ নেই। নিজের প্রবৃত্তি পূরণের অনেক বাহানা-পন্থা তার সামনে এসে যাবে। এর যে কোনোটি অবলম্বন করে সে তার স্বার্থসিদ্ধি করে নেবে।

বর্তমানে জীবনের প্রকৃত নষ্টামী হলো গোটা সমাজের মনোবৃত্তি ও মানসিকতা স্বার্থান্ধ ও মতলববাজ হয়ে গেছে। কোনো ব্যক্তি তার নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য বেপরোয়াভাবে যেকোনো অন্যায্য ও অন্যায় কাজ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাকে যদি কোনো বিভাগের দায়িত্বশীল বানানো হয় তবে সে খেয়ানত করে। সে যদি কোনো জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য নির্বাচিত হয় তবে সে নিজের সামান্য স্বার্থের জন্য দেশীয় ও জাতীয় বড় বড় স্বার্থ পদদলিত করতে এবং অন্যের ঘর উজাড় করে নিজের ঘর আবাদ করতে কোনো সংকোচবোধ করে না। সে যদি কারো অধিনস্থ হয় তবে কাজচোরা, অলস ও দায়িত্বহীনতায় অভিযুক্ত হয়।

কোনো মূল্যবান ফায়দা অথবা কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে এক ঘন্টার কাজে অনায়াসে এক মাস লাগিয়ে দিতে পারে। সহজ থেকে সহজ বিষয়কেও বছরের পর বছর গড়াতে পারে। এমননিভাবে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে শাসনব্যবস্থাকে ব্যর্থ অথবা বদনাম করতে পারে। সে যদি হয় কোনো কর্তা ব্যক্তি তবে চাটুকারিতা, স্বজনপ্রীতি, অপাত্রে তোষামোদী এবং ব্যক্তিগত অথবা বংশীয় স্বার্থে স্পষ্ট অন্যায় কাজে জড়িয়ে দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি করে থাকে। সে যদি ব্যবসায়ী হয় তবে মালে অপ্রয়োজনীয় বৃদ্ধির জন্য চোরাবাজারী এবং অবৈধ মুনাফাখোরীর মাধ্যমে লাখো গরীবের পেটে লাথি দেয়। সে যদি হয় অর্থলগ্নকারী তবে চড়া সূদের মহাজনীর মাধ্যমে গরীবদের ছাল-চামড়া পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে আসে এবং তাদেরকে বানিয়ে দেয় আরো নিঃস্ব ও অসহায়।

স্বার্থান্ধ মনোবৃত্তি

বর্তমানে ব্যক্তিসত্তা পেরিয়ে জামাত ও পুরো জাতির ওপর স্বার্থান্ধ ও স্বার্থপ্রবণতার শয়তান চড়ে বসেছে। রাজনৈতিক দলসমূহ শুধুই দলীয় স্বার্থের মোহে পতিত। ইউরোপ ও আমেরিকার গণতন্ত্রের ওপর জাতীয় স্বার্থান্ধতার ভূত চড়ে বসেছে। যাদের পায়ের তলায় পিষ্ঠ হচ্ছে ছোট জাতি, দেশ ও সম্প্রদায়। জাতীয় এই স্বার্থান্ধতা সারা দুনিয়াকে ব্যবসায়িক হাট ও শাসিত কলোনী বানিয়ে নিয়েছে। আর ভূপৃষ্ঠকে এক বিস্তৃত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছে। এই জাতীয় স্বার্থান্ধতার ফলেই যত বড় অন্যায্য ও অন্যায়ই হোক সব জায়েজ। তাদের সামান্য ইশারায় লাখো নিষ্পাপ মানুষকে অনিবার্য মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে। তারা এক জাতিকে অন্য জাতির ওপর সওয়ার করিয়ে দেয়। ভেড়া-ছাগলের মতো এক জাতিকে অন্য জাতির হাতে বিক্রি করে দেয়। ঐক্যবদ্ধ জাতিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেয়। ইউরোপের জাতীয় এই স্বার্থান্ধতা প্রথমে আরবীদেরকে ঘায়েল করে আরবের শাসনকর্তৃত্ব দখলের স্বপ্ন দেখে। পরবর্তী সময়ে এই স্বার্থান্ধতাই সিরিয়ার মতো ছোট্ট একটি দেশে চারটি স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা চালু করে। তারাই ইহুদীদেরকে সযতনে পুনর্বাসন করে। আজ ফিলিস্তিনে যা কিছু হচ্ছে সবই আমেরিকা, বৃটেন ও রাশিয়ার স্বার্থান্ধের ফল। হিন্দুস্তানে শত বছর যাবত যা কিছু ঘটেছে এবং পরবর্তী সময়ে শান্তিপ্রিয় এই দেশটিকে হত্যা ও বিশৃঙ্খলার স্বর্গরাজ্যে পরিণত করার পেছনে কারিশমা বৃটিশদের স্বার্থান্ধতা অথবা তাদের এদেশীয় চরদের। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও পশ্চিমা রাজনীতির প্রবর্তিত এই স্বার্থান্ধতা ৪৭ সালে এখানকার লোকদেরকে এতই অন্ধ ও উম্মাদ বানিয়ে দিয়েছিল যে, তাদের দ্বারা এমন সব অমানুষসুলভ আচরণ সংঘটিত হয়েছে যা দেখে চতুষ্পদ প্রাণীও লজ্জায় মুখ

লুকায়। আদম সন্তানদের গর্দান লজ্জায় ঝুঁকে আসে। আগামী দিনের ইতিহাসকারকেরা এসব ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে হয়ত সন্দেহ পোষণ করবেন।

স্বার্থান্ধতার ফলাফল

এই স্বার্থান্ধতা সমস্ত দুনিয়ায় এবং দেশের সকল শ্রেণীর মধ্যে এই বিশেষ প্রকৃতির জন্ম দিয়েছে। যার বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষ তার অধিকার আদায়ে অত্যন্ত পটু ও তৎপর, আর দায়িত্ব ও হক আদায়ে অত্যন্ত অলস ও বাহানা অন্বেষক। এই মানসিকতা ও প্রকৃতি গোটা দুনিয়ায় ব্যক্তিগত, সামষ্টিক ও গোত্রীয় টানাপোড়েন বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রত্যেকেই চায় নিজের হক ষোল আনা আদায় করতে আর অন্যের হক আদায় করার ক্ষেত্রে কোনো মনোযোগই নেই। দুনিয়ার দিকে তাকালে দেখা যাবে সমস্ত দুনিয়া অধিকার আদায় ও বাস্ত বায়নের এক অবাধ লীলাভূমি। অধিকার আদায়ের আবেগী শ্লোগান সবার মুখে মুখে অথচ ফরজ আদায়ের কোনো অনুভূতি কারো অন্তরে নেই। যে সমাজসভ্যতায় প্রত্যেকেই নিজের হক চায় কিন্তু সেখানে দায়িত্ব পালন করার মতো কেউ এগিয়ে আসে না সেখানকার জীবনের সমস্যা, সঙ্কট ও টানাপোড়েন মানুষের কোনো তদবিরে ও ব্যবস্থাপনায় দূর হবে না।

আমরা এই স্বার্থান্ধতার ওপর যতই চিৎকার করি, এর দ্বারা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যতই সমস্যা-সঙ্কটের সৃষ্টি হোক–এটি একটি কুদরতী জিনিস। যখন একথা স্বীকার করে নেয়া হবে যে, এ জীবনের পর আর কোনো জীবন নেই, এই বস্তুবাদী জীবনের স্বাদ-আহলাদ ছাড়া আর কোনো প্রাপ্তি বা বাস্তবতা নেই তখন আমাদের সংস্কৃতি, দর্শন ও গোটা প্রতিবেশ ওই স্বার্থান্ধতার দিকেই আমাদেরকে তাড়িত করবে। এর একটা দৃষ্টান্ত সনদ ও গ্রহণযোগ্য উপায়ে পেশ করছি–জীবনের পরিসমাপ্তিতে মৃত্যুর সব কল্পনা-ভাবনা যদি নিঃশেষ হয়ে যায়, চারিত্রিক মূল্যবোধ এবং জীবনের অন্যান্য উচ্চতর বাস্তবতা যখন নিছক বস্তুগত ও স্পর্শক অনুভূতির জন্য জায়গা খালি করে দেয়, পেট ও শরীর বিস্তৃত হয়ে সব প্রশস্ততা কুক্ষিগত করে নেয় আর অন্য সব বাস্তবতা নজর থেকে বিদূরিত করে দেয়া হয়–সেখানে মানুষ স্বার্থান্ধ হবে না কেন? সে এই একমাত্র জীবনের সুস্বাদ ও প্রাপ্তি কোন দিনের জন্য তুলে রাখবে এবং এ জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কায়েম করতে কেন কার্পণ্য ও ধীরগতিতে কাজ করবে? সুতরাং যখন তার উচ্চতর কোনো পর্যবেক্ষণ, শক্তির আধার কোনো সত্তার কর্তৃত্ব এবং সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপ্ত কোনো কর্তার ভয় অন্তরে না থাকে তখন সে ওই স্বার্থ হাসিলের জন্য যা তার জীবনে স্বাচ্ছন্দ ও গতিময়তা দান করে, এসব উপায়-উপকরণ অবলম্বন করতে ধীরে-সুস্থে সতর্ক পদক্ষেপ তার দ্বারা কখনও সম্ভব হবে না।

আর বস্তুপূজারী রাজনৈতিক দর্শন যখন মানুষের জীবনকে কোনো এক সম্প্রদায় ও দেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেয় এবং সব ধরনের সহমর্মিতা ও সহযোগিতামূলক ভাবনা মাথা থেকে বের করে একদেশ ও এক সম্প্রদায় অভিমুখী হয়ে যায়, সর্বোপরি মানবিক মূল্যবোধের উচ্চতর ধারণা থেকে নিজেকে সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ করে নেয় তখন মানুষের স্বার্থপ্রবণতা তার জাতি ও দেশের উর্ধ্বে উঠতে পারে কিভাবে? আর সে অন্যায় ও অন্যায্য কাজে জড়িয়ে পড়া থেকে কিভাবে সতর্কতা অবলম্বন করবে?

এই স্বার্থান্ধতা ও মতলববাজি বর্তমান সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার আজন্ম ব্যাধি। যতক্ষণ পর্যন্ত এর পরিশুদ্ধি না হবে ততক্ষণ বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা, সংশোধনভাবনা ও উৎকর্ষ কোনো ফলই বয়ে আনবে না। রাজনৈতিকভাবে দেশ স্বাধীন-স্বায়ত্বশাসিত হোক বা ভিনদেশী শাসনের অধীনে হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সোসাইটিতে স্বার্থান্ধ প্রবল থাকবে, সম্পদ ও সম্মানের মোহ দেশময় ছেয়ে থাকবে, দায়িত্বশীলদের ব্যক্তিত্বের ছাপ ও প্রভাব লোকদের অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে, সমাজের আন্তরিক টান, অত্যধিক ভোগ-বিলাস, মাত্রাহীন প্রয়োজন পূরণ এবং কুপ্রবৃত্তির চাহিদা নিবারণের দিকে হবে ততক্ষণ প্রকৃত প্রশান্তি ও আযাদীর বাস্তব ফল থেকে মাহরূম থাকবে।

সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাধি

আমরা দেখছি সমাজের ওপর অপ্রকৃত এক ছাপ ছেয়ে আছে। সমাজ বাহ্যিক সুখ-স্বাচ্ছন্দে উন্নতি লাভ করছে, ক্ষুধা ও দারিদ্রের হারও কমে আসছে, দেশের বিশৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণহীনতাও তেমন নেই, শিক্ষার হারও বাড়ছে, নতুন নতুন খাত ও সম্ভাবনা বেড়েই চলেছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই সমাজের অভ্যন্তরে রোগ বাসা বেঁধে আছে, যা ভেতর থেকে তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

অন্তরে যখন অন্যায় ঘর বাঁধে তখন নিছক সামাজিক অন্যায় মিটিয়ে দেয়ার দ্বারা কোনো দেশে প্রকৃত ইনসাফ ও সহমর্মিতার পরিবেশ গড়ে ওঠে না। সমাজের বাহ্যিক অবয়ব ছাড়াও জীবনের অনেক ময়দান রয়েছে যেখানে মানুষ অন্যের ওপর জুলুম করা, অন্যের হক মারা এবং অন্ততঃ অন্যকে ধাবিয়ে রাখার সব সুযোগ হাতের নাগালে। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর থেকে অন্যায্যতা, জুলুমের প্রতি আসক্তি এবং স্বার্থান্ধতার বীজ বের না করা হবে ততক্ষণ কোনো নাগরিক ব্যবস্থাপনা জুলুম, অন্যায় ও নৈতিকতা থেকে পবিত্র হতে পারবে না।

সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও উৎকর্ষের বুনিয়াদ

এশিয়াতেও যাদের স্বায়ত্বশাসন অর্জিত হয়েছে অথবা যেসব দেশ নতুনভাবে স্বাধীনতা লাভ করছে তারাও এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করছে যে, দেশের সমৃদ্ধি

ও জাতির উন্নতি নিছক জীবনের বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা ও উপকরণের ব্যাপ্তির মধ্যেই নিহিত নয়। বরং ওই উদ্দেশ্যের পরিশুদ্ধির মধ্যে নিহিত যার জন্য এসব উপায়-উপকরণ ব্যবস্থা হয়। উন্নয়ন ও অগ্রগতি সঠিক ধারায় সম্পন্ন হয় তখনই যখন ইনসাফ ও সহমর্মিতাবোধের স্পৃহা অন্তরে জায়গা করে নেয়। আর এসব জিনিস কোনো মেশিনারিজ অথবা রাজনৈতিক দলে উৎপাদন হয় না। এগুলো যদি কোনো মেশিনারিজ পদ্ধতি অথবা রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার কাজ হতো এবং জীবনোপকরণের স্বাচ্ছন্দ ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার বাহ্যিক চিত্রটি যদি প্রকৃত সুখ, নিরাপত্তা ও আন্তরিক প্রশান্তির পরিচায়ক হতো তবে ইউরোপ ও আমেরিকার মতো উন্নত রাষ্ট্রগুলো সুখ, প্রশান্তি ও নিরাপত্তার দিক থেকে দুনিয়ার জান্নাতে পরিণত হয়ে যেতো। কিন্তু সবাই জানেন, সেসব দেশে আন্তরিক কোনো প্রশান্তি নেই। সেখানকার আভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা ও অশান্তির কথা কারো কাছে অজানা নয়।

উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা, উৎকর্ষের পরিশুদ্ধি এবং ইনসাফ ও হামদর্দীর আন্তরিক স্পৃহার উৎসমূল হচ্ছে একটি সঠিক, শক্তিশালী ও রূহানী নৈতিকতাবোধসম্পন্ন ধর্ম যা মানুষের শরীরের সঙ্গে তার অন্তরকে শাসন করবে। যা তার কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের ভেতরে রাখবে। যা নিজস্ব রূহানী শক্তির দ্বারা মানবতার জন্য কুরবান করতে পারবে। যা এই সীমিত ও সংক্ষিপ্ত জীবনের বাইরে এমন এক লয়হীন জীবনকে তাদের সামনে এমন বাস্তবতার সঙ্গে উপস্থাপন করবে যার স্পৃহায় মানুষ ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের অভ্যস্ত হবে। তখন মানুষের সামনে খাওয়া-দাওয়া, ভোগবিলাস, আমোদ-প্রমোদ সম্পদ ও প্রতিপত্তি লাভ এবং পশুপ্রবৃত্তি পূরণের বাইরে জীবনের অন্য কোনো উদ্দেশ্য বড় হয়ে ধরা দেয়। মানবজীবনের উন্নত কিছু ভাবনা তাকে তাড়িত করে। ধর্মের এ ধরনের তালীমই ওই স্বার্থান্ধতা ও সংকীণ দৃষ্টিভঙ্গি দূর করতে পারে যা দ্বারা বর্তমান সমাজ, সভ্যতা ও রাজনীতির ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে।

ওই হাত বরকতময় যা মজলুম মানবতার শরীর থেকে কাটা বের করার জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, চোখের কাঁটা বের না করা পর্যন্ত সুখনিদ্রা কিংবা আন্তরিক প্রশান্তি কোনোটিই মিলবে না। স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্বশাসন অর্জন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং উন্নত চিন্তা-চেতনার পরিচায়ক। দেশ থেকে ক্ষুধা, বস্ত্রহীনতা, দারিদ্র দূর করা, সামাজিক বৈষম্য নির্মূল করা এবং প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা অত্যন্ত মোবারক কাজ। যারা মহতি এ কাজে অংশ নিবে তারা অবশ্যই মানুষের কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য। তবে তাকে নিজের কাজটিকে অপূর্ণাঙ্গ ও অপাংক্তেয় ভাবতে হবে যতক্ষণ না

মানুষের অন্তরের ফাঁস এবং চোখের কাটা দূর না করা হবে। তার অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি না করা হবে এবং পূত নিখুত না হবে, তার মধ্যে দায়িত্বানুভূতি না জাগবে, তার দৃষ্টি ভুড়িভোজন ও শরীরচর্চার উর্ধ্বে উঠে গোটা মানবতার কল্যাণের প্রতি নিবদ্ধ না হবে। তার মধ্যে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি ও বুলন্দ হিম্মত সৃষ্টি না হবে, এমনকি প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের পার্থক্য এবং অন্যের সঙ্গে অন্যায্য আচরণ করার মতো ফুসরতও সে পাবে না।

অনেকবার শরীরের এসব কাঁটা বের করার জন্য মানবতার মমতাময়ী হাত প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই তারা চোখে বিদ্ধ কাঁটা রেখে দিয়েছে এবং এভাবেই রাত হয়ে গেছে। কোনো দেশকে এর সন্তানেরা নিজেদের সর্বোচচ ত্যাগ ও বীরত্বের দ্বারা স্বাধীন করেছে, কোথাও প্রত্যয়দীপ্ত মানুষেরা স্বৈরাচারী রাজপ্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার করে ঐক্যমত্য ও জনসাধারণের সমর্থিত শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছে, কিন্তু দেলের ফাঁস দেলেই রয়ে গেছে। রাষ্ট্রের শাসন পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু শাসনপদ্ধতি ও প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। আজও বেশ কিছু দেশে সামাজিক বিপ্লব অব্যাহত আছে। কিন্তু লোকেরা পিটের কাঁটা ভালোভাবেই দেখছে অথচ চোখের কাঁটা দেখেও না দেখার ভান করছে। আজ মজলুম মানবতার আর্তনাদ শুধু একটাই–রাত হয়ে যাওয়ার আগেই যেন তাদের চোখে বিদ্ধ কাঁটাগুলো বের করে নেয়া হয়, যাতে প্রকৃত প্রশান্তি ও মানসিক তৃপ্তি অর্জিত হয়।

সমাপ্ত

গ্রন্থকার আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এর

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. সেই যে ত্রিশের দশকে তাঁর পূর্বপুরুষ বালাকোটের শহীদ আমীরুল মু'মিনীন হযরত সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী রহ. এর অনুপম চরিতগ্রন্থ 'সীরাতে আহমদ শহীদ' লিখে তারুণ্যদীপ্ত বয়সেই উর্দূ সাহিত্যের আসরে নিজের একটি উল্লেখযোগ্য আসন করে নিলেন তারপর বিগত প্রায় পৌণে এক শতাব্দী ধরে তাঁর কলম অবিশ্রান্তভাবে লিখে গেছে মুসলিম ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়গুলোর ইতিবৃত্ত। পাঁচ খণ্ডে রচিত 'তারিখে দাওয়াত ও আযীমত'-এর ভাবানুবাদ 'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস' তাঁর এমনি একটি অমূল্য গ্রন্থ। সিরাত থেকে ইতিহাস, ইতিহাস থেকে দর্শন ও সাহিত্য পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর অবাধ গতি। তাঁর 'মা যা খাসিরা'ল-আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমীন' Islam and the world-এর বঙ্গানুবাদ 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?' একখানি চিন্তাসমৃদ্ধ অনবদ্য আরবী গ্রন্থ যার অনুবাদ পৃথিবীর অনেক ভাষায় হয়েছে। 'নবীয়ে রহমত' ছাড়াও তাঁর রচিত 'আল মুরতাযা' শীর্ষক হযরত আলী রা. এর জীবনী গ্রন্থটি আরবী, উর্দূ ও ইংরেজি ভাষায় প্রভূত সুনাম অর্জন করেছে।

সমসাময়িক বিশ্বে তাঁর চেয়ে অধিকতর খ্যাতিমান ও বহুমুখি প্রতিভার অধিকারী অন্য কোনো আলেম জন্মেছেন কি না এবং থাকলেও তাঁর মতো এত অধিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন কি না সন্দেহ রয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রায় সকল জনপদে যেমন তিনি আমন্ত্রিত হয়ে সে সব দেশ সফর করেছেন, তেমনি নোবেল পুরস্কারতুল্য মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান 'বাদশা ফয়সাল' পুরস্কারে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন। তিনি একাধারে রাবেতায়ে আলমে ইসলামী এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, লখনৌর বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা এর রেক্টর এবং ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ পাটফরম মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের সভাপতি ছিলেন।

তাঁর অস্তিত্ব কেবল ভারতীয় মুসলমানদের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যই এক বিরাট নেয়ামত ছিল। তাঁর বেশ কিছু বই ইতোমধ্যে

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। একাধিকবার তিনি বাংলাদেশ সফরও করেছেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ এ পর্যন্ত ৭ খণ্ডে প্রকাশিত 'কারওয়ানে যিন্দেগী' শুধু তাঁর আত্মজীবনীমূলক নয়, এটা সমসাময়িক বিশ্বের অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও ব্যক্তির এক অপূর্ব আলেখ্যও বটে। তাঁর রচনায় আলামা শিবলী নোমানীর অনবদ্যতা, আলামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর সূক্ষ্মদর্শিতা, মাওলানা মানাযির আহসান গিলানীর সতর্কতা, মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর তাকওয়া, সর্বোপরি তাঁর পূর্বপুরুষ সাইয়েদ আহমদ বেরলভী রহ. এর দরদ প্রতিফলিত হয়েছে।

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ., মাওলানা মনযূর নোমানী রহ. ও রঈসুত তাবলীগ মাওলানা ইউসূফ রহ. এর অনেক মূল্যবান গ্রন্থে তাঁর লিখিত সারগর্ভ ভূমিকাগুলো পড়বার মতো। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ. এবং মাওলানা আব্দুল কাদির রায়পুরী রহ. এর খলীফা। বিগত হিজরী ১৪২২ সনের ২২ রমযান জুমার পূর্বে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াতরত অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। রায়বেরেলীর পারিবারিক কবরস্তানে রওযায়ে শাহ আলামুল্লাহয় তাঁকে দাফন করা হয়।